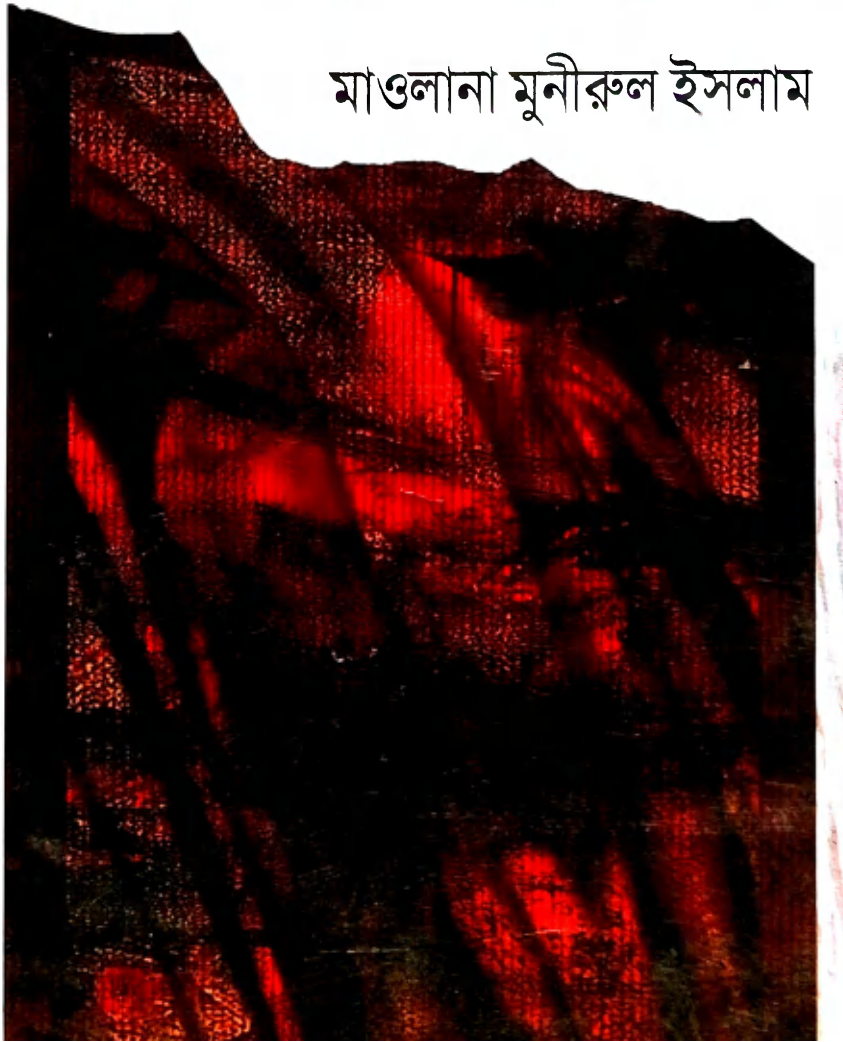
ইসলাম
ও
সমাজের
অসঙ্গতিমূলক গল্পগুচ্ছ

রক্তভেজা জায়নামায

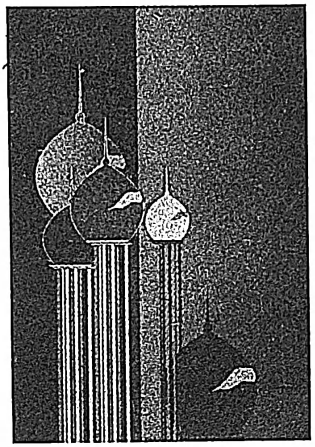


মাওলানা মুনীরুল ইসলাম

প্রকাশনা-৭৪

ইসলাম ও সমাজের অসঙ্গতিমূলক গল্পগুচ্ছ

রক্তভেজা জায়নামায



রচনায়
মাওলানা মুনীরুল ইসলাম
সহকারী সম্পাদক : মাসিক আদর্শ নারী

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
চকবাজার ঃ বাংলাবাজার, ঢাকা।

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

ইসলাম ও সমাজের অসঙ্গতিমূলক গল্পগুচ্ছ

রক্তভেজা জায়নামায

রচনায় : মাওলানা মুনীরুল ইসলাম

প্রকাশক : মাওলানা মাহবুবুল হাসান

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

নাদিয়া ভবন, ৫৯ চকবাজার, ঢাকা।
মুবাইল : ০১৯২৫০০৯৮২৫

ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার
মুবাইল : ০১৯২৫০০৯৮২৬

পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার
মুবাইল : ০১৯৮১৩৭০১৫৬

স্বত্ব : সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল : মার্চ ২০০৯ ঈসায়ী

মুদ্রন : নাদিয়াতুল কুরআন প্রিন্টার্স

আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।
মুবাইল : ০১৯২৫০০৯৮২৪

বিনিময় : ১৪০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ নয় উপহার

.....

প্রিয় 'শরীকে হায়াত'
আনজুমান আরা মুনীরকে
যে আমার সুখ-দুখ ভাগাভাগি করে নেয়।
আল্লাহ তাআলা পরজীবনে তাকে
জান্নাতী হুরদের সরদার বানিয়ে দিন।
..... লেখক

প্রকাশকের কথা

গল্পের মাধ্যমে যে বিশ্বমুসলিমের নির্যাতনের চিত্র, ইসলামের জায়িয-নাজায়িয, হালাল-হারাম, শিরক-বিদআত এবং সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ইত্যাদি এতো সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা যায়, তা *রক্তভেজা জায়নামায* গ্রন্থটি না পড়লে বোঝা যাবে না।

পাঠকমহল গ্রন্থটি পড়ে উপর্যুক্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে অবগত হওয়ার পাশাপাশি গল্পের মজাও বোনাস হিসেবে পাবেন। এর দ্বারা ছোট বড় সবশ্রেণীর পাঠক অনেক উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। নিঃসন্দেহে এটি বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন সংযোজন। সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষার এই মূল্যবান গ্রন্থটি লিখেছেন উদীয়মান তরুণ লেখক গল্পকার মাওলানা মুনীরুল ইসলাম। লেখকের এই গ্রন্থটি নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি।

গ্রন্থটি যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সম্মানিত পাঠকমহলের নজরে কোন ত্রুটি ধরা পড়লে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা লেখকের শ্রম কবুল করুন।

বিনীত

মাসউদুল হাসান

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী, ঢাকা।

তাং- ১০-০৩-০৯ ঈ.

লেখকের কথা

বক্ষমান বইয়ের ২০টি গল্পের মধ্যে *রক্তভেজা জায়নামায* শিরোনামে একটি গল্প রয়েছে বটে, কিন্তু শুধু উল্লিখিত গল্পকে কেন্দ্র করেই এই বইয়ের নামকরণ করা হয়নি, বরং পুরো বইয়ের বিষয়বস্তুর বিবেচনায় নাম নির্ধারণ করা হয়েছে।

সাহাবী হযরত আবু হোযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায় মুসলিম শরীফের এক হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাম পৃথিবীর জমিনকে জায়নামায বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর এই বইয়ে ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়িয-নাজায়িয, শিরক-বিদআত, রসম-কুসংস্কার তথা ইসলাম ও সমাজের কতিপয় অসঙ্গতি গল্পাকারে উপস্থাপনের পাশাপাশি মুসলিমবিশ্বের নির্যাতন-নিপীড়নের করুণ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই বক্ষমান বইয়ের নামকরণ করা হয়েছে *রক্তভেজা জায়নামায*।

রক্তভেজা জায়নামায-এর গল্পগুলো মূলতঃ সময় সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের পরামর্শ–অনুরোধে এবং কোনো কোনো পাঠকের নির্দেশে সেই গল্পগুলো দুই মলাটের মাঝখানে একত্রিত করতে অনুপ্রাণিত হয়েছি। বইটি বের করতে গিয়ে আরো অনেকের দোয়া ও সহযোগিতা পেয়েছি। বিশেষ করে আমার শ্রদ্ধাভাজন আম্মার খাস দোয়ার বরকতে বইটি বের হওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চিত তরান্বিত হয়েছে।

বোদ্ধা পাঠকমহল বইটি পড়ে সত্য-মিথ্যা ও আলো-আঁধারের পথ পার্থক্য করতে পারলে এবং আলোর পথের সামান্যতম দিশা পেলে আমার শ্রম সার্থক বলে ধরে নেব। আল্লাহ তাআলা এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াবী দান করুন।

নিবেদক

মুনীরুল ইসলাম

খামার গ্রাম, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

০৭ মার্চ ০৯

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই

১. ঘুমিয়ে কাজা করছি ফজর
২. পৃথিবীতে হলো হাশরের বিচার
৩. সেরা ঊনচল্লিশ এবং আমি
৪. বিজয় নামের পাখি (কবিতা)
৫. আল-কুরআনের জ্ঞানভাণ্ডার
৬. বেহেশতের সঠিক পথ (সম্পাদিত)
৭. গল্পে গল্পে তরুণ-তরুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ (সম্পাদিত)

গল্পসূচি

৯ / মর্মান্তিক ট্রাজেডি
১৭ / বছরের তৃতীয় ঈদ
২৫ / গুয়ান্তানামোর ভয়ংকর কারাগার
৩৩ / লাল হরফের মিছিল
৩৮ / বান্দার হকের জন্য
৪৪ / মায়ের ভালবাসা
৪৮ / মাতব্বরের দাপট
৫১ / একটি জন্মনিয়ন্ত্রণের পরিবার
৬১ / ইরাকী শিশুর আর্তনাদ
৬৪ / রক্তপিপাসু ছেলেধরা
দুর্গম পথের যাত্রী / ৭০
স্বার্থহীন উপকার / ৭৫
কলা শাহ'র গায়েবী মাজার / ৭৯
বাইরে মানুষ ভেতরে পশু / ৮৬
গরীব বলে দুঃখ নেই / ৮৮
গোমতীর পাড়ে কারবালা / ৯১
দুনিয়ার আজাব / ৯৭
ফিলিস্তিনী মেয়ের ভালবাসা / ১০১
ক'ফোটা আনন্দাশ্রু / ১১৬
রক্তভেজা জায়নামায / ১২২

মর্মান্তিক ট্রাজেডি

এক.

আবদুর রহমান সাহেবের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে। আজ দেখতে আসবে তার মেয়ে জান্নাতুল বুশরাকে। তাই আল্‌গা ঘরে সাজানো হলো কয়েকটি চেয়ার। যথাসময়ে এসে পৌঁছলো বুশরার বিয়ের মানুষ। তার রূপ-গুণ সম্পর্কে জেনে পছন্দ হলো পাত্রপক্ষের। তাই দেখতে এসেই বিয়ে হয়ে গেল তার। তুলে নেওয়া হবে ছ'মাস পর। এরমধ্যে মুলাকাতও হবে না দু'জনের।

বুশরা রাজধানীর একটি নামকরা মহিলা মাদরাসায় পড়াশোনা করে। সামনে তার কেন্দ্রীয় পরীক্ষা। 'বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ' এর অধীনে দাওরায়ে হাদীসের পরীক্ষায় অংশ নেবে সে। পড়াশোনায় খুব ভাল। মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনেক প্রত্যাশা তাকে নিয়ে। নিজের ও প্রতিষ্ঠানের সুনাম বয়ে আনবে সে। বিয়ের পরদিন সকালে তার বড় ভাই তাকে মাদরাসায় পৌঁছে দিয়ে এলো। পড়াশোনায় পুরো মনোনিবেশ করলো সে।

রাজধানীর প্রবেশদ্বারেই বুশরার মাদরাসা। সবুজ সমারোহে ছায়াঘেরা মায়াঘেরা পরিবেশে অবস্থিত সেটি। পরিবেশ অত্যন্ত নিরিবিলি। পড়াশোনার কয়েকটা বিভাগ রয়েছে সেখানে। প্রতিবছর পাশ করে বেরিয়ে যায় এক জামাত আলেমা। একদল হাফেজা। একঝাঁক আদর্শ মা।

মাদরাসার মুহতামিমের দায়িত্বে রয়েছেন একজন প্রথিতযশা অভিজ্ঞ আলেম। সুদক্ষ আলেমা-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে থাকে প্রায় সাড়ে চারশ' মেয়ে। হাদীসের কিতাবগুলোর দরস দেন রাজধানীর নামকরা মাদরাসার মুহাদ্দিসীনে কিরাম। পূর্ণ শরয়ী পর্দার মাধ্যমে পাঠদান করা হয় সেখানে। শরয়ী পর্দা মেনে চলে সেখানকার সবাই। আপাদমস্তক ঢেকে যাতায়াত করে ছাত্রী-শিক্ষিকাগণ। মানুষতো দূরে থাক, চন্দ্র-সূর্যও দেখা পায় না তাদের। কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় বেশ কয়েকবার ঈর্ষান্বিত ফলাফল করেছে সেটি। ভোর রাতে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করে মেয়েরা। তালীম-তারবিয়াত, আমল-আখলাকে অল্প সময়ের মধ্যেই সুনাম কুড়িয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

দুই.

এই দীনী প্রতিষ্ঠানটির জায়গা দখলের পাঁয়তারা চালাতে থাকে এক শ্রেণীর কুচক্রীমহল। মাদরাসার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায় তারা। ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকে নীরবে। পশ্চিমাদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে তারা। ইয়াহুদী-নাসারাদের দালালী করে বেড়ায় প্রতিটি ক্ষেত্রে।

পশ্চিমা অপশক্তিগুলো ভাল করেই অবগত যে, ইসলামের দুর্গ হচ্ছে এদেশের মসজিদ-মাদরাসাগুলো। এখান থেকেই দিনদিন বিস্তার লাভ করছে ইসলামের পরিধি। এগুলো বন্ধ করে দিতে পারলেই ইসলামের নাম-নিশানা মুছে যাবে চিরতরে। সাথে সাথে মসজিদ-মাদরাসার পবিত্র ভূমিও দখলে চলে আসবে তাদের চেলা-চামুণ্ডদের।

থেমে থাকেনি ইয়াহুদীদের পদলেহী গোলামেরা। ইতোপূর্বে দখল করে নিয়েছে বেশ ক'টি ছেলেদের মাদরাসা। বন্ধ করে দিয়েছে অসংখ্য দীনী প্রতিষ্ঠান। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে ছাত্র-শিক্ষকদের। ইলমে দীনের আহরণ থেকে মাহরুম করে দিয়েছে বেশুমার জ্ঞানপিপাসুদের। তালা ঝুলিয়েছে মুসলমানদের ইবাদতগাহ মসজিদগুলোতে। জবরদখল করে নিয়েছে অনেক মসজিদ-মাদরাসা। এবার শুরু করেছে অবলা মেয়েদের মাদরাসা দখলের পাঁয়তারা।

খাস কামরায় বসে সিগারেটের ধোয়া ছাড়ছে জবরদখলকারীদের গডফাদার আজমাল শিকদার। অপেক্ষা করছে কারো আসার। বিড় বিড় করে বলছে নিজে নিজে–'এটা ছেমরীদের মাদরাসা। জোরপূর্বক দখল করা যাবে না। করতে গেলে নারী নির্যাতনের মামলায় ফেঁসে যেতে হবে। যার পরিণতি ভয়াবহ। কাজ সারতে হবে নীরবে। গভীর....।' এমন সময় দরজা খটমট করে কামরায় প্রবেশ করলো ৭/৮ জন যুবক। তাদেরকে কাছে নিয়ে বসালো আজমাল শিকদার। হাত নেড়ে চেড়ে চুপে চুপে বুঝিয়ে দিল একটা কিছু। শুনতে পারেনি তারা ব্যতীত তৃতীয় পক্ষের কেউ। কথা শেষ করে তাদের হাতে ধরিয়ে দিল একটা ব্রিফকেস। তারা কামরা থেকে বের হয়ে যেতে যেতে বললো–'বস্! আপনার কোনো টেনশন করা লাগবে না। আমরাই সব সাইরা ফালামু।'

তিন.

২০০২ সালের ১৫ মার্চ সন্ধ্যা। মাদরাসার দফতরে কয়েকজন শিক্ষক নিয়ে বসে আছেন মুহতামিম সাহেব। তালীম-তারবিয়াতের ব্যাপারে আলাপ করছেন তারা। এমন সময় মাদরাসায় এলেন পাঁচজন আগন্তুক। দু'জন পুরুষ তিনজন বোরকা পরিহিত মহিলা। ছাত্রী ভর্তির কথা বললেন তারা। ঘুরে দেখার ইচ্ছা করলেন মাদরাসার ভেতরে গিয়ে।

সন্ধ্যায় বহিরাগত মহিলাদের ভেতরে প্রবেশের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও অনুমতি দিলেন মুহতামিম সাহেব। একটু জোরপূর্বক যেতে চাইলেন পুরুষরাও। যেতে দেওয়া হলো না তাদেরকে। ভেতরে প্রবেশের ব্যাপারে সার্বক্ষণিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে পুরুষদের জন্য। শেষ পর্যন্ত দফতরে বসলেন তারা। চোখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন চারদিক। মাদরাসায় বর্তমানে কতজন ছাত্রী আছে–জানতে চাইলেন তারা।

সর্বমোট ছাত্রী সংখ্যা ৪৩২ জন। তাদের মধ্যে আবাসিক ৩৩২ জন। বাকিরা অনাবাসিক। গতকাল সাপ্তাহিক ছুটিতে গিয়েছে অনেকে। বর্তমানে মাদরাসায় অবস্থান করছে ২৮০ জন ছাত্রী।–অকপটে বললেন হযরত মুহতামিম সাহেব।

এভাবে খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয়ে আলাপের এক পর্যায়ে ভেতর থেকে মহিলারা বেরিয়ে এলে তারা প্রস্থান করেন। তাদের ব্যাপারে কেমন যেন একটা সন্দেহ হলো বিচক্ষণ নাযিমে তালীমাত সাহেবের। বিষয়টি তিনি গোপন রাখলেন। ভেতরের মহিলারাও সন্দেহ করার মতো বিষয়ে আলাপ করলেন।

চার.

গভীর রাত। সারাদিনের ব্যস্ততম শহর এখন নীরব-নিস্তব্ধ। কোনো জনমানবের সাড়া শব্দ নেই। অনেক আগেই ঘরে ফিরে গেছে ব্যস্ত মানুষেরা। মাঝে মধ্যে সদর রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটে যাচ্ছে মালবাহী ট্রাক, ভ্রমণ বিলাস নাইট কোচ। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে নাইট গার্ডদের হুইসেল। ডাস্টবিনের কাছে ঘেউ ঘেউ করছে ক্ষুধার্ত কুকুরগুলো। দূরের রাস্তায় মিটমিট করে জ্বলছে ল্যাম্পপোস্টের বাতিগুলো। থেমে থেমে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ হচ্ছে মাদরাসার আশেপাশে। এসব শব্দ এই মাদ্‌রাসার ছাত্রী-শিক্ষিকাদের জন্য নতুন কোনো বিষয় নয়। ছাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রায়ই গোলাগুলি হয়। মাঝে মধ্যে শোনা যায় এসব শব্দ। শুনতে শুনতে এখন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

লেখাপড়া শেষে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে পুরো মাদরাসা। ঘুম নেই শুধু বুশরার চোখে। শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে সে। এবার বাড়ি থেকে আসার পর কাটতেই চায় না তার দিনগুলো। একেকটা দিন একেকটা বছর মনে হচ্ছে তার কাছে। ভাবতে থাকে শুধু সেই স্বপ্নের পুরুষের কথা, যার জন্য লালন করে আসছিল বুকভরা ভালবাসা, জীবনের সবকিছু। বারবার চোখের পর্দায় ভেসে উঠছে তার মায়াবী চেহারা। মনভরে দেখতেও পারেনি তাকে। প্রাণখুলে দুটো কথাও বলতে পারেনি তার সাথে। সুযোগই কোথায়? তাকে দেখার সময় একটু আধটু যা কথা হয়েছিল। তখন কি আর এত কথা বলা যায়? চোখ তুলে তাকানো যায়? লজ্জায় মরি মরি অবস্থা হয় তখন.....।

এসব ভাবতে ভাবতে দেয়াল ঘড়ির দিকে নজর পড়লো তার। ড্রিম লাইটের আলোতে দেখা গেল রাত পৌনে তিনটা। তার পাশে ঘুমন্ত

ফাতেমাকে ডাকলো সে। এক ডাকেই আড়মোড়া ভেঙে উঠে গেল ফাতেমা। তাহাজ্জুদ পড়বে তারা। বিছানা ছেড়ে বাইরে গেল দু'জনে। মাদরাসার অভ্যন্তরের আঙিনায় এলে বৃষ্টির মতো কিছু পড়ার শব্দ পায় তারা। তাদের শরীরেও পড়লো কয়েকটি ফোটা। বৃষ্টি হচ্ছে নাকি? ভাবলো তারা। আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকায় দু'জনে। না! আকাশ পরিষ্কার। এমন দিনে বৃষ্টি হওয়ার কথা নয়।

অজু-ইস্তেঞ্জা সেরে সরল মনে কামরায় প্রবেশ করলো বুশরা ও ফাতেমা। দু'-চার রাকাত তাহাজ্জুদ পড়ে চুপচাপ বিছানায় গা এলিয়ে দিল ফাতেমা। নামাযান্তে মুনাজাত ধরলো বুশরা। "রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্‌দুনইয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা আজাবান্‌নার। ইয়া রাব্বাল আলামীন! আমার জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন। আমাকে ইলমে নাফে আমলে সালেহ দান করুন। দীনের জন্য কবুল করে .....।"

শেষ করতে পারলো না বুশরার মুনাজাত। মাদরাসার একপ্রান্ত থেকে কতগুলো মেয়েলী কণ্ঠের ভয়ার্ত চিৎকার ভেসে এলো তার কানে। আ-গু-ন! আ-গু-ন! ছুটে গেল বুশরা ও ফাতেমা। মুহূর্তেই আগুন ধরে গেল পুরো মাদরাসায়। বাঁচার দায়ে দিক-বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে অসহায় ছাত্রীরা। বুশরা একামরা ওকামরা থেকে উদ্ধার করতে থাকে তাদের। উদ্ধার করতে গিয়ে এক কামরায় অগ্নিকুণ্ডলীর মধ্যে আটকা পড়ে গেল সে। সেখান থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারলো না এই নববিবাহিতা কুমারী। নিজেকে কুরবান করে দিয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে নিল বুশরা। ভুলে গেল দুনিয়ার সব আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস।

অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ দেওয়া হয় ফায়ার সার্ভিস গ্রুপকে। তড়িৎ গতিতে আসতে থাকে তারা। পথিমধ্যে বাধার সৃষ্টি করে কতিপয় যুবক। মাদরাসায় পৌঁছতে ভুল রাস্তা দেখিয়ে বিভ্রান্ত করে তারা। দিকভ্রান্ত হয়ে অচেনা পথে ঘুরতে থাকে ফায়ার সার্ভিস গ্রুপ। ঘণ্টাখানেক দেরি হয়ে যায় মাদরাসায় পৌঁছতে। ফলে পুড়ে নিঃশেষ হতে থাকে মাদরাসা ভবন। ইলমে নববীর সাজানো বাগান।

করুণ কান্নার রোল পড়ে যায় সারা মাদরাসায়। 'আগুন-আগুন' চিৎকারে প্রকম্পিত হয়ে উঠে মাদরাসা ক্যাম্পাস। ভারি হয়ে উঠে আকাশ-বাতাস, শূন্য-মহাশূন্য। 'থ' বনে যায় আসমানের ফেরেশতারা। আল্লাহর আরশে আজীম পর্যন্ত কেঁপে উঠে অবলাদের আর্তনাদে। মাদরাসার দক্ষিণ পাশের গেইট দিয়ে ছাত্রীদেরকে উদ্ধার করেন মাদরাসা কর্তৃপক্ষ। নিয়ে যান তাদেরকে নিরাপদ হিফাজতে। এর আগেই বদ্ধ কামরায় আটকা পড়ে শাহাদাত বরণ করে ৯ জন ছাত্রী। আহত হয় অর্ধশতাধিক। নিখোঁজ হয় অনেকে।

কাঠ-টিনের তৈরি দোতলা মাদরাসার এক চিলতেও অক্ষত থাকেনি আর। নিমিষেই ভস্মিভূত হয়ে গেল সম্পূর্ণ মাদরাসা। পুড়ে ছারখার হয়ে গেল লাখ লাখ টাকার সম্পদ। ছাই হয়ে গেল কুরআন-হাদীসের কপিগুলো। নিঃশেষ হয়ে গেল ইলমে দীনের বাগিচাটি।

জাতীয় সংবাদপত্রগুলোতে হেড লাইন হয়ে প্রকাশিত হলো এ খবর। আর অগ্নিসংযোগের মূল বিষয়টা ধামাচাপা দেওয়ার অপচেষ্টা করে বাম পত্রিকাগুলো। এ ঘটনায় বিষাদের কালো মেঘে ছেয়ে যায় নীল আসমান। শোকের সাগরে ভাসতে থাকে সারাদেশ।

পরে ধ্বংসস্তুপের নিচে পাওয়া যায় মাথার খুলি ও বিচ্ছিন্ন হাত-পা। পেট্রোল বোমা মেরে নাশকতামূলক ঘটানো হয় এ অগ্নিকাণ্ড । নিক্ষেপ করা হয় পেট্রোল জাতীয় পদার্থ। ছাত্রীরা যখন আগুন থেকে আত্মরক্ষা করে বাইরে আসে, তখন রাস্তার কিছু যুবক বিভিন্ন আক্রমনাত্মক কথা বলে তাদেরকে। উস্কানীমূলক ব্যবহার করে তাদের সাথে। তবুও মুখ খুলে প্রতিবাদ করেনি অবলা ছাত্রীরা।

পাঁচ.

অগ্নিকাণ্ডের পরের দিন। কোথেকে যেন আবির্ভাব ঘটে একদল বোরকাধারীর। টেক্সিতে করে মাদরাসায় পৌঁছে তারা। ধ্বংসস্তুপের কাছে দাড়িয়ে সাক্ষাৎকার দেয় এক ভিডিওকারী মিডিয়াকে। তাদের সাথেই আসে এই ভিডিওকারী প্রতিষ্ঠান। আশপাশের লোকজনকে সরিয়ে ভিডিও করে সাক্ষাৎকারটি। তাদের পরিচয় জানতে চান মাদরাসা কর্তৃপক্ষ। কোনো জবাব দেয়নি তারা। টেক্সি ঘুরিয়ে দ্রুত কেটে পড়ে সেখান থেকে।

ছয়.

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েন কর্তৃপক্ষ। হতবিহ্বল হয়ে পড়েন শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। কী হবে ছাত্রীদের? তবুও ঈমানী পরীক্ষা হিসেবে মেনে নেন এই মর্মান্তিক ট্রাজেডিকে। সব আল্লাহ তাআলার ফয়সালা। শেষ পর্যন্ত মামলা দায়ের করা হয় মাদরাসার পক্ষ থেকে। গ্রেফতার হয় কতিপয় সন্ত্রাসী টাইপের যুবক। কিন্তু ন্যায্য বিচার পাননি মাদরাসা কর্তৃপক্ষ।

অভিভাবকদের বিশ্বাসেও ফাটল ধরেনি এ হৃদয়বিদারক ঘটনায়। নীরবে বরণ করে নেওয়ার চেষ্টা করেন তারা। তবুও বুক ফেটে বেরিয়ে আসে সন্তানহারা পিতা-মাতার করুণ আহাজারি। বেদনায় নীল হয়ে যায় কুমারী বধূহারা স্বামী। তাদের আহাজারিতে দুমড়ে মুচড়ে পড়তে চায় খুঁটিবিহীন আসমান। শোকের সাগরে ভাসতে থাকে তামাম মাখলুক।

তারা কখনো নিজের মনকে সান্ত্বনা দেন শহীদের পিতা-মাতা হতে পেরে। আশায় বুক বাঁধেন অনন্ত জীবনে জাযায়ে খায়ের পাওয়ার।

তখন ছিল পড়াশোনার গুরুত্বপূর্ণ সময়। নিজ নিজ মেয়েদেরকে নিয়ে দেশের অন্যান্য মহিলা মাদরাসায় ছোটাছুটি করতে থাকেন অভিভাবক মহল। আলাপ করেন ভর্তির ব্যাপারে। তাদেরকে ভর্তি করতে রাজি হলেন না অন্যান্য মাদরাসার মুহতামিমগণ। কিছুদিন ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেন তাদেরকে। বলেন–'অচিরেই অগ্নিদগ্ধ মাদরাসা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা যদি এখন আপনাদের মেয়েদেরকে ভর্তি করি, তাহলে ভবিষ্যতে ঐ মাদরাসার কী হবে? হঠাৎ করে কোথায় পাবে ছাত্রী? তারাতো মাদরাসা একেবারে বন্ধ করে দেননি। আমরা চাই এমন একটি দীনী প্রতিষ্ঠান যেন বিলীন হয়ে না যায়। দোয়া করুন মাদরাসাটি যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে।'

যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ পেয়ে ফিরে আসেন অভিভাবকগণ। চেষ্টা করতে থাকেন মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করার। অপরদিকে ছাত্রীরাও অনড়-অবিচল। আগুনে পুড়ে পুড়ে যেন খাঁটি মুমিনায় পরিণত হয়ে গেছে তারা। সুদৃঢ় হয়ে উঠে তাদের ঈমান-বিশ্বাস। মজবুত হয়ে উঠে মাদরাসার প্রতি তাদের

মহব্বত। অস্থি-মজ্জার সাথে মিশে যায় তাদের অগ্নিবিদগ্ধ মাদরাসার প্রেম-ভালবাসা। অন্য কোথাও ভর্তি হবে না তারা। পড়াশোনা করতে হলে এখানেই করবে।

সাত.

ছাত্রীদের আগ্রহ-উদ্দীপনা, অভিভাবক ও তাওহিদী জনতার সহযোগিতা এবং আল্লাহ তাআলার খাস মেহেরবানীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে এ. মাদরাসা। ছাত্রীদের জোয়ার নেমে আসে এখানে। কোত্থেকে যেন ছাত্রী আসতে থাকে জামাতে জামাতে। নবউদ্যমে শুরু হয় তালীম-তারবিয়াতের কার্যক্রম। চলতে থাকে কুরআন-হাদীসের দরস ও তাদরীস।

কিন্তু আজো বিচার হলো না সেই কুচক্রী মহলের। যারা চিরতরে খালি করে দিল পিতা-মাতার বুক। চরম আঘাত হানলো যুবক স্বামীর ভালবাসার মানসপটে। যারা সমূলে ধ্বংস করতে চেয়েছিল নববী উদ্যান। জবরদখল করতে চেয়েছিল মাদরাসার পবিত্র ভূমি। সেই বিচারের বাণী আজো নিভৃতে কাঁদে। ❐

বছরের তৃতীয় ঈদ

এক.

ভিক্টোরিয়া কলেজের ইন্টারের ছাত্র জামিল। দ্বিতীয় বর্ষের খুব মেধাবী ছাত্র। ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রয়েছে তার। আবহমান কালের নীতি-নৈতিকতাবিবর্জিত অসুস্থ রাজনীতির ধার ধারে না সে। সাতাশে জুন তার বড় বোন রুম্মানার বিয়ে। সে তার বন্ধু তারেক, কাউসারসহ আরো অনেকের বাসায় বিয়ের কার্ড দিয়ে সবশেষে এলো অন্তরঙ্গ বন্ধু আরিফের কাছে। সে বিয়ের কথা আগে থেকেই জানে, তবুও প্রিয় বন্ধুকে কার্ড দিয়ে দাওয়াত না দিলে হয় না।

সে আরিফদের বাসায় এসে দেখে সে রিসিভার হাতে কোথাও রিং করার ইচ্ছা করছে। জামিল তার সামনে কার্ডটা বাড়িয়ে দিতেই সে হতচকিৎ রিসিভার রেখে দিয়ে বললো–তুই এসেছিস ভাল হয়েছে, নইলে আমাকে ফোন করতে হতো।

জামিল : তার মানে?

আরিফ : মানে, তোর বোনের বিয়েতে আমি থাকতে পারছি না। কারণ সাতাশে জুন আমাদের ঈদ।

ঈদের কথা শুনে জামিল চমকে উঠে বললো।–ঈদ, কিসের ঈদ? তুই একি বলছিস?

আরিফ : তুই জেনেও না জানার ভান করছিস।

জামিল : না, সত্যিই আমি জানি না।

আরিফ : কেন ঈদে আজম, ঈদে মীলাদুন্নবী! সেদিন বারই রবিউল আউয়াল। সে তারিখে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন। তাই ছাত্র সেনার পক্ষ থেকে আমরা সেদিন ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করে থাকি। অনেক লোকের.....।

জামিল : সে লেকচার আর দিতে হবে না। কীভাবে পালিত হয় সে ঈদ সেটাই বল। জানোয়ার টানোয়ার কুরবানী করা হয় নাকি?

আরিফ : ফাজলেমি করিস না তো!

জামিল : ফাজলেমি না, মানে বলছিলাম কি? ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহায় তো যথাক্রমে সিয়াম পালন এবং পশু কুরবানী করা হয়। তাই ভাবলাম, তোদের ঈদে আজমেও হয়তো একটা কিছু.....।

আরিফ প্রফুল্ল চিত্তে বললো–অবশ্যই হয়, তবে তুই যা ভাবছিস তা নয়। সেদিন শহরের অলি-গলিতে বের করা হয় শোভাযাত্রা স্বাগত মিছিল। অনুষ্ঠিত হয় জশনে জুলুস মাহফিল। সেসব অনুষ্ঠান সাজানো হয় রঙবাহারী আলোকসজ্জায়। আরো কত্তো কী। বিশেষ করে দারোগা বাড়ি মসজিদে। সেখানে বাগদাদী হুজুর কেবলা এসে থাকেন। আমাকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। যদি তোর বোনের বিয়ের ব্যাপারটা না হতো, তাহলে আমিই তোকে দাওয়াত ...।

জামিল তার কথা টেনে নিয়ে বললো–'আমাকে তোর দাওয়াত করতে হবে না, আমি এমনিতেই তোদের ঈদে থাকবো। দেখবো তোরা সেখানে কী করিস।'–এই বলে সে চলে এলো।

দুই.

আজ বারই রবিউল আউয়াল। আরিফদের ঈদে আজম। অপরদিকে জামিলের বোনের বিয়ে। বিয়ের অনুষ্ঠান বিকেল চারটায় সম্পন্ন হয়ে গেছে। জামিল ডায়েরীটা হাতে নিয়ে সময় মতো রওয়ানা দিল দারোগা

বাড়ির উদ্দেশ্যে। সে একাই যাচ্ছে, ইচ্ছে করেই কাউকে সঙ্গী করেনি। যাওয়ার পথে আশেপাশের কয়েক জায়গায়ই তার নজরে পড়লো জশনে জুলুসের ছোটখাটো প্যান্ডেল। সেগুলোর চারপাশে টিপটপ বাতির কোলাহল। সে মাগরিব গিয়ে পড়লো দারোগা বাড়ি। জামাতেই পড়েছিল প্রথম। পরে অবশ্য দোহরিয়ে নিতে হয়েছে বাধ্য হয়ে।

ঈদে আজমের মূল অনুষ্ঠান শুরু হলো বাদ মাগরিব। আরিফ অনুষ্ঠানের উপস্থাপক। সে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য নাম ঘোষণা করলে ক্লীন শেভ ও প্যান্ট-পাঞ্জাবী পরা এক ছাত্র দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করলো। তার তিলাওয়াত শুনে জামিল খুব দুঃখ পেল। তারপর শুরু হলো নাতে রাসূল। একজন গিয়ে পরিবেশন করলো :

সকল ঈদের ঈদ, ঈদে মীলাদুন্নবী
মুমিনেরই ঈদ.....।

অন্য একজন : আজি ঈদে মীলাদুন্নবী মাহফিল
নবীর আশিক কে আছো ভাই
হওরে শামিল.....।

এ ধরনের নাতে-গানেই কেটে গেল রাতের প্রায় এক প্রহর। অনুষ্ঠানের এ চিত্র দেখে জামিলের হাসি পেল, সাথে সাথে দুঃখও। জামিল পরিস্থিতিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। হঠাৎ তার নজরে পড়লো মঞ্চের একপাশে একটি আলীশান কুরসী পাতা। তার উপরে আরবী লেখাবিশিষ্ট বড় চাদর। কুরসীটি এখনও শূন্য। সেটিতে এখনও কেউ বসেনি। জামিল কুরসীর ব্যাপারে জানতে চাইলে আরিফ আশ্চর্য হয়ে জবাব দিলো–তুই জানিস না? এটি কুরসীউন্নবী, নবীজীর চেয়ার। আজ নবীজী এটিতে আসন গ্রহণ করবেন এবং আমাদের অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন।

আরিফের মুখে এ কথা শুনে জামিলের মাথায় আসমানটা ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো। সে আর কোনো কথা বলতে পারলো না। ওয়াজের নামে তারা হক্কানী উলামায়ে কিরামকে গালমন্দ করলো রাতভর। পরিশেষে খিচুরীর সানকি নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে শেষ হলো তাদের ঈদে আজম। জামিল বিষন্ন মনে বাসায় ফিরে এলো।

তিন.

জামিল অনেক দিন ধরে ভাবছে, ঈদে আজমের ব্যাপারে আরিফকে কিছু বলবে। কিন্তু সময় হয়ে উঠছিল না। একদিন কলেজ ক্যাম্পাসে বসে বসে আলাপ করছে তারা দু'জন। ক্যাম্পাসজুড়ে আরো অনেক কপোত-কপোতী রসালাপে নিমগ্ন। এক পর্যায়ে কথার প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে জামিল বললো–বর্তমানে সমাজে যারা আহলে সুন্নাত বলে দাবি করছে, তারা কতটুকু নবীর সুন্নাত পালনে সচেষ্ট? তাদের মাঝে কতটুকু আছে নবীপ্রেমের অনুভূতি? আমার ধারণা প্রেমের ছিটে ফোটাও নেই তাদের মাঝে।

জামিলের কথা শুনে আরিফ বলে উঠলো– তুই বললেই হলো নবীপ্রেম নেই, অবশ্যই আছে। তা না হলে 'নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলাল্লাহ' শ্লোগান উঠে কেমনে? আজানের আগে 'আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' উচ্চারিত হয় কেমনে?

জামিল : শোন! প্রেম-ভালবাসা দু'প্রকার। প্রথমতঃ মুখে মুখে ভালবাসা প্রকাশ করা, যার কোনো গভীরতা নেই। দ্বিতীয়তঃ অন্তরে তার শিকড় প্রোথিত হওয়া। এটাই প্রকৃত ভালবাসা। তুই যেগুলোর কথা বললি, এগুলো ভালবাসার মৌখিক প্রকাশ মাত্র। সবচেয়ে বড় কথা হলো এগুলো হচ্ছে বিদআত তথা পথভ্রষ্টতা।

আরিফ : এগুলো যে বিদআত তুই কী করে জানলি?

জামিল : ইসলামী বই পড়ে এবং আলেমদের থেকে শুনে। কোনো বস্তুকে তার বিপরীত বস্তু দ্বারা পরিচয় লাভ করা যায়। এখন মিথ্যাকে সত্য দ্বারা, বিদআতকে রাসূলের সুন্নাত দ্বারা জানতে হবে। যাক, তথা কথিত ড. আলী আজগর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করেছিল।' আহলে সুন্নাত এর নামধারীরা কি তার কোনো প্রতিবাদ করেছিলেন? করেননি। করেছিলেন এবং করে আসছেন কওমী মাদরাসার আলেম সমাজ। আর রাসূলের নামধারী আশেকরা মুখে মুখেই বলতে পারে, যা আন্তরিকতা শূন্য। ওরা রবিউল আউয়াল এলেই শুধু ফুলে ফেঁপে উঠে। কবি যথার্থই বলেছেন :

"রবিউল আউয়াল এলে তোমারি গান গাই
রবিউল আউয়াল গেলে তোমায় ভুলে যাই
মুখে বলি ভালবাসি অন্তরেতে নাই.....।"

অন্তরেতে নেই বলেই আমাদের সমাজে সুন্নাতের বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না।

জামিল ও আরিফ তাদের কথায় মত্ত। ইতোমধ্যে বেশ ক'জন মেয়ে তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। জামিলের কারণে সে কিছু করতে পারেনি, নতুবা সে টিটকারী মারতো। মেয়েদের টিটকারী মারা তার বদস্বভাব।

আরিফ জামিলের কথার জের ধরে বললো–সুন্নাতের যেটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে আমাদের মাধ্যমেই হয়েছে। আমরা শবে বরাত, শবে কদর ইত্যাদি পালন করে থাকি, সুতরাং আমরাই নবীজীকে ভালবাসি।

জামিল : কোথায় শবে বরাত, আর কোথায় রাসূলের প্রেম-ভালবাসা। তোরা শবে বরাতের মাধ্যমে কি রাসূলকে ভালবাসিস? হ্যাঁ, নবীপ্রেম আছে তোদের শবে বরাতের হালুয়া-রুটিতে, নবীর নাম উচ্চারিত হওয়ার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়ে চুম্বন করে আঁখিযুগলে মলার মধ্যে। আচ্ছা, এগুলোর কি কোনো ভিত্তি আছে?

আরিফ : এগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু বারই রবিউল আউয়ালে যে ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করি, সেটিও কি নবীপ্রেমের প্রমাণ বহন করে না?

জামিল : করবে কি করে! বারই রবিউল আউয়ালে ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা, নবীপ্রেমের আতিশয্যে জশনে জুলুসের আয়োজন করা তো বিদআত। আর বিদআত হচ্ছে জঘন্যতম অপরাধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–"নিশ্চয়ই উত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব, উত্তম চরিত্র হলো মুহাম্মদের চরিত্র এবং নিকৃষ্ট কাজ হলে বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআত হলো পথভ্রষ্টতা।" যে পথভ্রষ্টতার কাজ কিনা তোরা করছিস। নবীপ্রেমের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন যে সকল সাহাবায়ে কিরাম তারা তো কখনো জশনে জুলুস বা ঈদে মীলাদুন্নবী পালন

করেননি? সেজন্যই তো এটা বিদআত। মীলাদুন্নবীর নামে তোরা কি করিস, তা তো সেদিন স্বচক্ষেই দেখে এলাম।

জামিলের মুখে এসব কথা শুনে আরিফ অবাক কণ্ঠে বললো–তাহলে কি নবীজীর জন্মদিনে আমরা কোনো উৎসব করবো না?

জামিল : অবশ্যই করবো। অবাক না হয়ে শোন! প্রথম কথা হলো, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বারই রবিউল আউয়ালেই জন্ম গ্রহণ করেছেন তা কিন্তু স্পষ্ট বলা যাচ্ছে না। বরং এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অপরদিকে এ তারিখে তাঁর ইন্তেকালের ব্যাপারে কোনোরূপ মতবিরোধ নেই। তাই সেদিন ঈদে মীলাদুন্নবীর নামে 'ঈদ নাম্বার থ্রী' পালন করার চেয়ে সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা করা হবে শ্রেয়। কেননা তার মধ্যে বিদআতমূলক কোনো কাজ তো নেই-ই শুধু পুণ্যে ভরপুর। যেমন সেদিন শিল্পকলা একাডেমীতে 'পরশ পাথর ইসলামী সাংস্কৃতিক ফোরাম'র উদ্যোগে সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা সভা হয়েছে। এতে জেলা কওমী মাদরাসা সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারী আল্লামা আশরাফ আলী সাহেব প্রধান অতিথির আলোচনা করেছেন। নবীজীর জীবনাদর্শের উপর কী দারুণ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা। আর তোরা.....? যাক আমি সেদিকে যাচ্ছি না। শোন! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–"আল্লাহ তাআলা তোমাদের এ (মিহিরজান ও নওরোজ) উৎসবের পরিবর্তে অন্য দু'টি দিন তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একটি ঈদুল ফিতর অপরটি ঈদুল আজহা।" এখানে কী ঈদে মীলাদুন্নবী নামে তৃতীয় কোনো ঈদের কথা বলা হয়েছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস দ্বারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছিস, যে ঈদে মীলাদুন্নবী নামে ঈদ উৎসব পালনের কোনো অবকাশ নেই।

জামিল তার কথা শেষ করতে পারলো না, হঠাৎ আকাশজুড়ে বৃষ্টি নামলো। সবাই তড়িগড়ি করে কলেজের ভেতরে ঢুকে গেল। সেদিন তাদের মধ্যে আর কোনো কথা হলো না।

চার.

অন্য একদিন আবার দু'জনে বসলো। জামিলের আগের কথার জের টেনে আরিফই প্রথম মুখ খুললো : সেদিন তো খুব ওয়াজ করলি। ঈদে মীলাদুন্নবী আমরা পালন করলেই দোষ, সরকারীভাবে যে পালিত হচ্ছে সেটা বলবে কে?

জামিল : সরকার তো আর নগরে নগরে সফর করে পালন করে না, তোদেরকে দিয়েই পালন করানো হচ্ছে। অবশ্য এ ব্যাপারে ইসলামী নেতৃবৃন্দের উদ্যোগ নেওয়া দরকার। সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয় সমীপে দাবি জানিয়ে বিষয়টি সুরাহা করা জরুরী।

কথায় কথায় অনেক সময় কেটে গেল। এক সময় মিনার চুড়ে আছরের আজান ভেসে এলো। জামিল আরিফকে নামাযের কথা বললে সে জানালো–তার সাথে টুপি নেই। তার কথা শুনে জামিল বললো–এই তো তোদের অবস্থা। আবার সুন্নী মতার্দশের ভিত্তিতে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাস! শত ধিক তোদের মতাদর্শকে। তোর বাবা তথাকথিত 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের' জেলা সাধারণ সম্পাদক। আর তোদের ঘরে কিনা ঝুলছে নেতাজীর ছবি। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–"যে ঘরে কুকুর বা কোনো জীব-জন্তুর ছবি থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।" তুই জানিস না যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাতলে দেওয়া পথ ব্যতীত মুক্তির বিকল্প কোনো পথ নেই? আল্লাহ তাআলা বলেন : "(হে নবী!) আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ করো।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার নিকট তার পিতা, পুত্র এবং সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় বা ভালবাসার পাত্র না হবো।"

অতএব, আমাদের অন্তরে রাসূলের প্রকৃত ভালবাসা থাকতে হবে। না থাকলে সৃষ্টি করতে হবে। আর ঈদে মীলাদুন্নবী নামক ঈদ পালন করে ধ্বংসের সাগরে নিজেকে ভাসিয়ে না দিয়ে রক্ষা করতে হবে।

জামিলের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনে আরিফের গায়ে কাঁপন ধরে গেল। তার অজান্তে ঝরে পড়লো দু'ফোটা অশ্রু। এতদিনে সে সত্যকে জানলো। সে জামিলের হাত ধরে ওয়াদা করলো–'এতদিন আমি অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথে ছিলাম। আজ আমি ওয়াদা করছি, আর গোমরাহীর পথে নয়। পথভ্রষ্টতার বেড়াজাল ছিন্ন করে সত্য ও আলোর পথে ফিরে যাবো। সারাটা জীবন রাসূলের পালিত তরীকায় যাপন করবো ইনশাআল্লাহ।'

জামিল তার এ আকস্মিক পরিবর্তন দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে পড়ে নিল আলহামদুলিল্লাহ। ❐

গুয়ান্তানামোর ভয়ংকর কারাগার

এক.

২০০৪ সাল। কুয়েত নগরী। শান্তিময় পরিবেশ। বাংলাদেশের মতো দুর্নীতি কিংবা অরাজকতার ছোঁয়া নেই। নতুন বিয়ে করেছেন আবদুল্লাহ আল মারুফ। বিয়ের এক সপ্তাহ পরই ফুরিয়ে যায় তার ছুটি। তাই মা, ভাই-বোন ও নববধূ তারান্নুমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসেন তার কর্তব্যস্থলে। দীনের এক সাহসী মুজাহিদ তিনি। আফগানিস্তানে তালিবান সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে নিয়োজিত। জিহাদের ডাক পড়লে ঝাপিয়ে পড়েন ময়দানে।

আল মারুফ এই কিস্তে আফগানিস্তান এসেছেন প্রায় দেড় মাস হলো। এর মধ্যে তার কোনো খোঁজখবর না পেয়ে পেরেশান হয়ে পড়েন তার মা, বধূ, ভাই-বোন সবাই। তাই পেরেশানী হালকা করতে তার কাছে পত্র লিখলেন নববধূ তারান্নুম। যথাসময়ে আল মারুফের হাতে পৌঁছলো তার পত্র। কিন্তু কর্মব্যস্ততার দরুণ জবাব লেখার সময় করতে পারেন না তিনি। তারপরও একদিন কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন আল মারুফ–

প্রিয়তমা!

সালাম নিও। আশা করি কুশলে আছো। আমি তোমার দোয়ায় ভাল আছি।

পর সমাচার–তোমার পত্র পেয়েছি। জবাব লিখতে দেরি হওয়ার জন্য দুঃখিত। পত্র পড়ে জানতে পারলাম তোমার আবেগ-অনুভূতির কথা।

প্রিয়ন্ত! আমি জানি তুমি আমাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসো। সরসময় কাছে পেতে চাও। তোমার পাশে থেকে তোমার নরম কোমল হাতের আলিঙ্গন পেতে আমারও ইচ্ছে হয়। আমিও তোমাকে প্রাণাধিক ভালবাসি। কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে দীনের ভালবাসাকে প্রাধান্য দিতে হচ্ছে তোমার ভালবাসার উপর।

কেননা আমি তো জন্মেছি এক বিপ্লবী জীবন নিয়ে, এক মহান দায়িত্ব নিয়ে। দীনের এই নাজুক মুহূর্তে তোমার পাশে থাকতে দেয় না আমায়। তবুও কোনো অনুতাপ নেই, শাহাদাতের সিঁড়ি বেয়ে তোমাকে পেতে চাই সেই অনন্ত জীবনে। অবশ্যই পাবো তোমার সহযোগিতা পেলে।

আম্মাজানের প্রতি খেয়াল রেখো। আমার সালাম দিয়ে দোয়া করতে বলো। মারিয়া ও তালহাকে আমার স্নেহশীষ দিও। নিয়মিত তালীমের কাজ চালিয়ে যেও। সুযোগ পেলে তোমার মুলাকাতে আসবো। আর কথা নয়, এখানেই কলম তুললাম।

ইতি

তোমার আল মারুক

পত্রখানা ভাঁজ করে এয়ারমিলে ভরে নিলেন তৎক্ষণাৎ। কোয়ার্টারের প্রধান গেইটের পাশে এসে দেখে নিলেন আশপাশ। রাস্তা আপদমুক্ত। গাড়ি স্টার্ড দিয়ে সোজা চলে এলেন পোস্ট অফিসে। পত্রখানা পোস্ট করে আবার ফিরে যাচ্ছেন আপন গন্তব্যে। অকস্মাৎ তিনি পড়ে যান উত্তরাঞ্চলীয় দুষ্ট লোকদের হাতে। ওরা মার্কিন সৈন্যদের হাতে তুলে দেয় তাকে। পাঠিয়ে দেয় তাকে গুয়ান্তানামোর ভয়ংকর কারাগারে।

দুই.

কিউবার গুয়ান্তানামো বেতে অবস্থিত এ কারাগার। সেখানে নতুন কেউ পদার্পন করে মুহূর্তের জন্য হলেও থমকে যাবে। পতপত করে উড়ছে মার্কিনী পতাকা। ম্যাক ডোনাল্ডসের সোনালী লগো। পথচারি লোকজনের চোস্ত-ইংরেজী কথাবার্তা। এসব দেখে বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে–জায়গাটি আমেরিকা নয় কিউবা।

সেই ১৯০৩ সালের কথা। মার্কিন ডাক বিভাগের প্রধান টমাস স্ট্রাড মালমাকে কিউবার শাসক নিযুক্ত করে আমেরিকা। কিউবার আইনী মারপ্যাঁচের সুযোগে টমাসের কাছ থেকে কিউবার গুয়ান্তানামো দ্বীপ লীজ নেয় তারা। স্বাক্ষরিত হয় সমঝোতা চুক্তি। এই দ্বীপকে তাদের নৌঘাঁটি ঘোষণা করে তারা।

গুয়ান্তানামো ১১৬ কিলোমিটারের এক নয়নাভিরাম দ্বীপ। যা আমেরিকা থেকে প্রায় ১২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পৃথিবীতে আমেরিকার বাইরে এটিই সর্বপ্রাচীন মার্কিন নৌঘাঁটি। এখানে আমেরিকা ২৫X৪ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে স্থাপন করেছে একটি ক্যাম্প। সেই ভয়ংকর কারাগার। আল-কায়েদা অথবা আফগানিস্তানের তালিবানদের সাথে সম্পর্ক আছে–এমন সন্দেহভাজন ব্যক্তিদেরকে বন্দী করে রাখে এখানে। বন্দীরা যেন একজন অপরজনের সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগ করতে না পারে, সেজন্য কারা প্রকোষ্ঠগুলো ঘিরে আছে কাঁঠের তৈরি ওয়াচ টাওয়ার। সীমানা বেঁড়ার উপর সবুজ তেরপলের বাধা। যার ফলে বন্দীরা দেখতে পারে না বাইরের দুনিয়া। সুনীল আসমান, তেজোদীপ্ত সূর্য। বাইরের কারো পক্ষেও তেরপলের বাধা ডিঙিয়ে বন্দীদের দেখা অসম্ভব। সাংবাদিকদেরকেও যেতে দেওয়া হয় না এর ভেতরে।

দুনিয়ার বর্বরতম অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে এটি। সেখানে মার্কিন আইন, আন্তর্জাতিক আইন, সামাজিক সৌজন্য আর মানবিক আচরণ বীভৎস উল্লাসে পদদলিত হয় প্রতিনিয়ত। এর ব্যাপারে চমৎকার মন্তব্য করেছেন এক মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ–'গুয়ান্তানামো দ্বীপে পৌঁছলে আপনি দেখতে পাবেন পৃথিবীর যাবতীয় আইন-কানুন, সামাজিক সৌজন্য-ভব্যতা, মানবাধিকার, সদাচরণ ও মানবিক নীতি-নৈতিকতা এখানে ছটফট করতে করতে ত্যাগ করছে অন্তিম নিঃশ্বাস। মনে হয় ২৫X৪ কিলোমিটারের এই এলাকাটিতে মানবতা হাজার বছর পেছনে চলে গেছে।'

এটা পৃথিবীর জঘন্যতম নির্যাতন ক্যাম্প। নিকৃষ্ট ও নিষ্ঠুরতম টর্চার সেল। এখানে আছে বিশ্বের ৪৩টি দেশের ৬৮০ জন মানব সন্তান। ইতিহাসের বর্বরতম কায়দায় অত্যাধুনিক নির্যাতনের শিকার তারা। বন্দীদের মধ্যে আছেন আল মারুফের সেই দেশীয় সহকর্মীরা, যারা তার সাথে ত্রাণ ও

পুনর্বাসন কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাদের সাথে শামিল হয়েছেন বৃটেনের নয়জন নাগরিক। তাদের মধ্যে আছে বিশ বছরের আসিক ইকবাল ও শফিক রসূল। আরো আছেন ছাব্বিশ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড হক্স। কসোভোতে দায়িত্বরত ছিলেন তিনি। আছেন চল্লিশ বছর বয়সী আরব নাগরিক মুহাম্মদ হাবীব। পাকিস্তান থেকে গ্রেফতার করা হয় তাকে। এখন তাদের সাথে শামিল হয়েছেন নববিবাহিত যুবক আবদুল্লাহ আল মারুফ।

তিন.

আল মারুফের পত্র যথাসময়ে পৌঁছলো তারান্নুমের হাতে। পত্র পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। পেরেশানমুক্ত হলেন পাগলপারা জননী। খুশি হলো ছোট ভাই তালহা ও বোন মারিয়া। পাল্টা জবাব লিখলেন তারা। রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠালো পত্রখানা। কিন্তু পত্র ফেরত চলে আসে তাদের কাছে। এয়ারমিলের গায়ে লেখা–'প্রাপকের সন্ধান না পেয়ে ফেরত দেওয়া হলো'। তা দেখে মোচড় দিয়ে উঠে জনম দরদী মায়ের ভেতরটা। কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েন তারা। নতুন করে আবার পাঠালেন পত্রখানা। এবারও ফেরত চলে আসে তা। খামের গায়ে লেখা–'প্রাপক নিখোঁজ তাই ফেরত দেওয়া হলো'। আরো বিভিন্নভাবে খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করেন তার। কিন্তু কোনো খবর নেই। সহকর্মীদের কেউ দিতে পারে না তার সন্ধান। পেরেশান হয়ে পড়েন সবাই। প্রতিবেশীরা এখানে সেখানে জটলা বেঁধে বলাবলি করছে–'হয়তো আল মারুফ আর নেই'। তার মা, স্ত্রী, ভাই-বোনেরও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে এ ব্যাপারে।

ছেলের ভাবনায় ভেঙে পড়ে আল মারুফের মায়ের শরীর। অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে থাকে নববধূ তারান্নুমের। খুলে ফেলেন হাতের রিনিঝিনি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অলংকারাদি। বন্ধ করে দেন তৈল, স্নো, পাউডার, যতসব প্রসাধনী ব্যবহার। সিঁতে তুলেন না আর মেঘকালো কেশে। পরিত্যাগ করেন সব বিলাসিতা। নকশাদার শাড়ি খুলে পরে নেন শুভ্র ধূতি। সাজেন এক কুমারী বিধবা। যে কারো মায়া হয় তাকে দেখে। পাথরহৃদয়ও বরফের মতো গলে যায় তখন। স্বামীমৃত্যুর শোক পালন করতে থাকেন তারান্নুম।

চার.

আল মারুফকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতে থাকে গুয়ান্তানামো কারাগারে। বেঁধে ফেলে তার হাত-পা। টেপ এঁটে দেয় তার মুখে। মুণ্ডিয়ে ফেলে চুল-দাড়ি এমনকি চোখের ভ্রুও। চোখে লাগিয়ে দেয় সীসার কালি। নাকে পরিয়ে দেয় বিশেষ ধরনের মাস্ক। কানে ফিট করে অত্যাধুনিক যন্ত্র, বিলোপ করে দেয় শ্রবণশক্তি। হাতে পরিয়ে দেয় লোহার ভারি শিকল।

এগুলো এমন ধরনের নির্যাতন যন্ত্র, যেগুলো বিকল করে দেয় পঞ্চইন্দ্রিয়কে। ফলে আল মারুফ এখন আর দেখতে পারে না, কথা বলতে পারে না, শুনতে পারে না, শুঁকতে পারে না। পারে না কিছু স্পর্শ করতে। সবদিক দিয়ে পঙ্গু করে ফেলে তাকে। দুই মিটার দৈর্ঘ্য ছোট একটা লোহার খাঁচায় পুরে পায়ের উপর বসিয়ে রাখে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস। আজান দেওয়া, অজু করা, নামায পড়া এবং অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী থেকেও তিনি বঞ্চিত। পিপাসার তোড়ে পানি চাইলে মুখে প্রস্রাব করে দেয় মার্কিনীরা। প্রস্রাব-পায়খানার মতো প্রাকৃতিক প্রয়োজনেও যৌক্তিক শিথিলতা পান না তিনি। সবমিলিয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন আল মারুফ। এ অবস্থা শুধু তার নয়। এখানে আরো যারা বন্দী রয়েছেন। একই দশা সবার কপালে।

এই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি সহ্য করতে না পেরে বেছে নেয় তারা আত্মহত্যার পথ। ২০০০ সালের আগস্ট থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ত্রিশজন বন্দী আত্মহত্যার চেষ্টা করলেও পারেনি তারা সফল হতে। গত বছর আগস্ট মাসে চারজন বন্দী বিছানার চাদর ও তোয়ালে দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়। অপর এক বন্দী ক্ষুর দিয়ে তার হাতের কব্জি বিচ্ছিন্ন করে ফেলার চেষ্টা করেন। তারা জানেন–আত্মহত্যা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ, তারপরও তারা মুক্তি পেতে চায় এ দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে।

আল মারুফরা এ দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে তখনই সাময়িকভাবে মুক্তি পায়, যখন তাদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালানোর জন্য বের করা হয় এই লৌহ খাঁচাগুলো থেকে। তাদেরকে সেখান থেকে বের করে খুলে ফেলে বিশেষযন্ত্রগুলো। চালাতে থাকে শারীরিক নির্যাতন। এই নির্যাতন যদিও

অসহনীয়, কিন্তু খাঁচার শাস্তির তুলনায় অনেক কম। তাদেরকে যেন খাঁচা থেকে বের করা হয়, সেজন্য তারা মনে মনে দোয়া পর্যন্ত করেন। খাঁচা থেকে বের করে টুকরো টুকরো করে ফেললেও আপত্তি নেই তাদের। এত জঘন্যতম ও নির্মম লৌহ খাঁচার শাস্তি।

কারাগারের বাইরের কেউ জানে না শেষ পর্যন্ত কী ঘটে আল মারুফদের কপালে। তাদের বেলায় কোনো প্রকার শুনানি, রুলবুক এবং আনুষ্ঠানিক অভিযোগের নেই কোনো বালাই। নিতে হয় না বন্দীদের আত্মপক্ষ সমর্থন বা উকিলের কোনো সহযোগিতা। বন্দীদের অধিকার বলতে কিছুই নেই এখানে। মার্কিন সরকার যা খুশি করতে পারেন বন্দীদের নিয়ে। নিজেদের সুবিধার্থে বদলে ফেলে বন্দীদের নাগরিকত্ব।

পাঁচ.

আরব নাগরিক মুহাম্মদ হাবীব। অস্ট্রেলিয়ার সাথে তার নিছক সম্পর্ক নয়, সেখানকার নাগরিকত্ব ছিল তার কাছে। তাকে গ্রেফতার করা হয় পাকিস্তান থেকে। তাকে অস্ট্রেলিয়ায় ফেরত এনে এখানেই মামলা রুজু করার কথা ছিল। এখানে নিয়মানুযায়ী শুনানির পর যদি অন্য রাষ্ট্র তাকে তলব করে, তখন জর্জের অনুমোদনক্রমে তা করার কথা ছিল।

মার্কিন প্রশাসন এবং অস্ট্রেলীয় কর্তৃপক্ষ এই আইনের আওতাধীন ছিল। কিন্তু এফবিআই মিশরে স্থানান্তরিত করে তাকে। বদলে ফেলে নাগরিকত্ব। অস্ট্রেলীয়র পরিবর্তে মিশরী সাব্যস্ত করে তাকে। এরপর মিশরী এনওসির মাধ্যমে স্থানান্তরিত করে গুয়ান্তানামোর কারাগারে। ভোগ করতে থাকে নির্মম শাস্তি। এত শাস্তি ভোগ করেও তাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি মুসলিম মুজাহিদ আল মারুফরা। বিনয় ও নম্র ব্যবহার দেখিয়ে যান মার্কিন সৈনিকদের সাথে।

আলজেরিয়ার প্রখ্যাত আইনজ্ঞ হাসান আরাবী। গুয়ান্তানামো বিষয়ক চেয়ারম্যান তিনি। কয়েকজন মুক্তিপ্রাপ্ত মুজাহিদের সাথে কথা হয় তার। মুজাহিদগণ বলেন–'কিছু কিছু মার্কিন প্রহরী সহানুভূতিমূলক আচরণ করতো আমাদের সাথে। কখনো কখনো তারা নিজেদের পকেটের টাকা

ব্যয় করে আমাদেরকে কিনে দিত এটা সেটা। তারা সবসময় ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো আমাদের কাছে। এভাবে ধীরে ধীরে মুসলমান হয়ে যায় কয়েকজন প্রহরী। এখনও অব্যাহত রয়েছে এ ধারা।'

ছয়.

আমেরিকাকে হুঁশিয়ার করে দিল কিউবার পার্লামেন্টারিয়ানগণ। আমেরিকা যেন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কিউবার উপর তাদের দখলদারিত্ব ত্যাগ করে চলে যায়। তারা আরো বলেছেন–'পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে লোকদেরকে ধরে এনে অমানবিক নির্যাতন চালানোর ব্যাপারটি কিউবা আর হতে দিতে পারে না।' অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিন সিনেটর গুয়ান্তানামোর বন্দীদের ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রাম্সফেল্ডের প্রতি। কিন্তু এসবের প্রতি তেমন পাত্তা দেয় না আমেরিকা।

যুবাইর ইউহানা বৃটেনের নাগরিক। তিনি গ্রেফতার হন আফগানিস্তান থেকে। তাকে পাঠানো হয় গুয়ান্তানামো কারাগারে। এ ব্যাপারে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় বৃটিশ পত্র-পত্রিকায়। রিপোর্ট পেয়ে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে বিক্ষুব্ধ জনতা। চাপের তীব্রতা সইতে না পেরে টনি ব্লেয়ার জর্জ বুশের সাথে আলাপ করে এ ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত মার্কিন সরকার আদালতে সোপর্দ করতে বাধ্য হয় যুবাইর ইউহানাকে।

কিন্তু স্বদেশী বন্দীদের ব্যাপারে এখনও কোনো তদবীর করেনি মুসলিম বিশ্বের কোনো প্রতিনিধি। এক রাষ্ট্রীয় সফরে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন পাকিস্তানের সামরিক শাসক পারভেজ মুশাররফ। খুবই তাৎপর্যবহ ছিল এ সফর। কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ সফরেও বন্দীদের ব্যাপারে মুখ খুলেননি তিনি। দেখাননি কোনো প্রকার মানবিক আচরণ।

অপরদিকে জেনেভা কনভেনশনের নীতি লঙ্ঘন করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কনভেনশনের ১৮ নং ধারা মতে বন্দীদের হাতকড়া পরানো যাবে না। ২৬ নং ধারা মতে তাদের জন্য আলাদা খাদ্য কক্ষ, ২৮ নং ধারা মতে আলাদা ক্যান্টিন, ৩৪ নং ধারা মতে ব্যায়ামাগার, ৭১ নং ধারা মতে পত্র আদান-প্রদান, ৭২ নং ধারা মতে পার্সেল পাঠানোর ব্যবস্থা রাখতে বাধ্য। কিন্তু এক

নির্মম বৈপরিত্ব্য চলছে গুয়ান্তানামোর বন্দীদের বেলায়। জেনেভা কনভেনশনের একটি সুবিধা তো ভোগ করতে পারেই না, উপরন্তু দেখা, কথা বলা, শ্রবণ করা, গন্ধ শোঁকা ও স্পর্শ করার মতো মৌলিক অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত।

সাত.

কারাগারের দুঃসহ যন্ত্রণা সইতে সইতে একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পরেন আল মারুফ। পিয়ে নেন শাহাদাতের অমীয় সুধা। তার মুখবয়বে ফুটে উঠে তৃপ্তির হাসি। জিহ্বা লেগে আছে ঠোঁটের সাথে। যেন এইমাত্র পান করেছেন শাহাদাতের সুমিষ্ট শরবত। মরেই যেন বেঁচে গেলেন তিনি। পরিত্রাণ পেলেন দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে। বৃথা যেতে দিলেন না জনম দরদী মায়ের ধারণা। এতদিনে সফল ও স্বার্থক করে তুললেন নববধূ তারান্নুমের শোক পালন।

আর কারাগারের দুঃসহ যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন আল মারুফের বাকি সাথীরা। অন্য সহযোদ্ধারা। তার মতো মরতে পারলেই যেন অবসান হবে এ দুঃসহ যাতনার। তাই একটা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন প্রতিনিয়ত। গুণছেন শান্তিদায়ক মৃত্যুর প্রহর। ❐

লাল হরফের মিছিল

এক.

একটি ছোট্ট কুঁড়ে ঘর। মাঝখানে মুলিবাঁশের ঝাঁপ। একদিকে বসে নোট করছে হামযা। ফাঁকে ফাঁকে পড়া ধরে নিচ্ছে নয়-দশ বছরের ছোট বোন হাফসা। আরেক দিকে রান্না-বান্নার টুকটাক কাজ করছেন তার মা। এই তিনজন নিয়েই তাদের সংসার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে হামযা। অনার্সের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। এই পর্যন্ত পৌঁছতে অনেক বাধা-বিপত্তি মাড়াতে হয়েছে তার।

ছোট কালে তার বাবা মারা যায়। মারা যাওয়ার সময় একমাত্র ভিটেমাটি ছাড়া কিছুই রেখে যাননি তিনি। তাই টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই চলছে তাদের সংসার। তাদের এই টানাপোড়েন দেখে অনেকেই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে কোনো কাজে লেগে যেতে বলেছে হামযাকে। কিন্তু তার আগ্রহ দেখে লেখাপড়া ছাড়তে দেননি তার মা। হাতের কাজ করে যা পান তা দিয়ে কোনো রকমে সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। আর দু'টি টিউশনি করে লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যাচ্ছে হামযা।

সে পড়াশোনায় যেমন ভাল, স্বভাব চরিত্রেও তুলনা হয় না। নামায রোযার খুবই পাবন্দ। মানুষের বিপদ-আপদ, অসুখ-বিসুখে পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। নিঃস্বার্থ এগিয়ে আসে ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে । উদ্যোগ নেয় ভাল ভাল কাজের। শ্রম দেয় মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণের বিভিন্ন কাজে। গাঁয়ের পথের সাঁকোটি হয়েছে তার উদ্যোগেই। এসব ভাল কাজের জন্য গ্রামবাসীর প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছে সে।

দুই.

আগামীকাল সকালে ঢাকা চলে যাবে হামযা। তার মা যথাসাধ্য ভাল খাবারের ব্যবস্থা করেছে তার জন্য। রাতে গুঁড়ি কুটেছে তার মা ও বোন।

ফজর নামায আদায়ান্তে কিছুক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করলো হামযা। তারপর বইপত্র গুছিয়ে রেডি হয়ে যায় সে। হরেক রকম পিঠা নিয়ে এলো হাফসা। ঝটপট খেয়ে নিলো কিছু। মায়ের কাছে দোয়া চেয়ে বেরিয়ে পড়লো ঢাকার উদ্দেশ্যে। তখন মাথার ব্যান্ড ও স্কুল ব্যাগ আনার আবদার করে বসে হাফসা। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে এসব আনার আশ্বাস দেয় হামযা। আশ্বাস পেয়ে অশ্রুসজল হয়ে উঠে তার চোখ।

হাফসাকে ঘরে থাকতে বলে হামযার সাথে পুকুর পাড়ের তেঁতুল গাছ পর্যন্ত আসে তার মা। হাফসাও চলে আসে তার পিছু পিছু। স্টেশন পর্যন্ত দেখা যায় এখান থেকে। যাবার সময় আবার দোয়া চাইলো হামযা। মুখে থুথু দিতে দিতে সাবধানে চলাফেরা করার উপদেশ দিলেন তিনি। হাফসাকে আদর দিয়ে স্টেশনের দিকে পা বাড়ালো সে।

হামযার গমনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল নয়নে চেয়ে থাকে হাফসা। আর নীরবে অশ্রু ঝরতে থাকে মায়ের দু'চোখ বেয়ে। অপলক চেয়ে থাকেন হামযার দিকে। হামযাও মাঝে মাঝে পেছনে ফিরে দেখে নেয় তার মা ও ছোট বোনকে। তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকেন হামযার মা। স্বপ্নরা দানা বাঁধে তার মনে–হামযা লেখাপড়া করে অনেক বড় হবে, ভাল চাকরি করবে, তখন আর তাদের কষ্ট ক্লেশ থাকবে না.....।

একসময় আড়াল হয়ে যায় হামযা। হাফসা তার মাকে উঠতে বললে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে উঠে আসেন তিনি।

তিন.

তখন ছিল ১৯৫২ সাল। বাংলাদেশ-পাকিস্তান এখনও ভাগ হয়নি। বাংলাদেশকে বলা হয় পূর্ব পাকিস্তান আর পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান। সারাদেশে বইতে থাকে ভাষা আন্দোলনের জোয়ার। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এ শ্লোগানের সূত্র ধরে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের বিক্ষুব্ধ জনতা। অনেক উলামায়ে কিরামও শরীক হয় এ আন্দোলনে। নীরব থাকতে পারেনি টগবগে তরুণ হামযাও।

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই শুরু হয় এ আন্দোলন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতো পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। বৈষম্য দেখাতো বাংলা ভাষার প্রতি। উর্দুর সাথে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের। কিন্তু এ দাবি মানেনি পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। পাকিস্তানের মুদ্রা, মনি অর্ডার ফরম, ডাকটিকেট ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় দলিলপত্রে ইংরেজীর সাথে উর্দু ব্যবহারেরও সিদ্ধান্ত নেয় তারা।

কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ইংরেজ সচিব মিস্টার গুডউইন। তার স্বাক্ষরিত একটি সার্কুলার পাঠানো হয় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষার প্রোগাম ছিল সেখানে। ইংরেজী, ফেঞ্চ, উর্দু ও হিন্দী ভাষা অন্তর্ভূক্ত করার কথা হয় তাতে। কথা হয় ল্যাটিনের মতো মৃতপ্রায় ভাষার অন্তর্ভূক্তিরও। হয় না শুধু পাকিস্তানের মেজরিটি জনগণের মাতৃভাষা বাংলার কথা। এ ধরণের অবহেলার প্রতিবাদে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে বিক্ষোভের দাবানল। গড়ে উঠে আন্দোলন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্সের অধ্যাপক আবুল কাসেম সাহেব গড়ে তুলেন তমদ্দুন মজলিস। এক উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরোধিতা করেন নেতা কর্মীগণ। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবির উপর একটি পুস্তিকা বের করেন ১৫ সেপ্টেম্বর। নাম 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু'। ব্যাপক কর্মসূচির মাধ্যমে আন্দোলনকে বেগবান করে তুলেন তিনি। ১২ নভেম্বর ফজলুল হক হলে এ দাবি উত্থাপন করেন কয়েকজন মন্ত্রীর সামনে। উপস্থিত মন্ত্রীবর্গও সমর্থন করেন এ দাবি। নেওয়া হয় শতাধিক শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিকদের স্বাক্ষর। প্রধানমন্ত্রীর নিকট মেমোরেন্ডাম পেশ করা হয় ১৯৪৭ সালের ১৪ নভেম্বর। ৫ ডিসেম্বর মিছিল সহকারে ঘেরাও করা হয় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের বাস ভবন। ৬ ডিসেম্বর শুধু উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদে সভা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলতলায়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম। সভাশেষে বের হয় বিক্ষোভ মিছিল। ৩০ ডিসেম্বর গঠন করা হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। জোরদার হয়ে উঠে আন্দোলন। এভাবে মিছিল-মিটিং, ধর্মঘট ইত্যাদির মাধ্যমে চলে যায় ৪/৫ টি বছর। হতাহত ও গ্রেফতার হয় অনেক নেতাকর্মী। নিরুপায় হয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন খাজা নাজিমুদ্দীন।

চার.

১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারী। পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভা। হাজার হাজার মানুষের পদভারে মুখরিত সভাস্থল। সবার মধ্যে টান টান উত্তেজনা। মাইক্রোফোনের সামনে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন। সবার তীক্ষ্ম দৃষ্টি তার প্রতি। চুক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত ঘোষণা করে বসলেন তিনি। 'উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' ঘোষণা শুনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বিক্ষুব্ধ জনতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় ৩০ জানুয়ারী। গঠন করা হয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ। তার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল বের হয় ৪ ফেব্রুয়ারী। বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় জনসভা। বক্তব্য রাখেন মাওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। নিন্দা করেন সরকারের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের। দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করেন বাংলা ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার। ওয়াদাবদ্ধ হন অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাবার। সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করেন ২১ ফেব্রুয়ারী।

পাঁচ.

দু'মাস পরপর বাড়িতে আসে হামযা। কিন্তু এবার দু'মাসের বেশি হয়ে গেছে এখনও আসছে না সে। ছেলের কথা ভাবতে কেমন যেন করে উঠে হামযার মায়ের মন। তেঁতুলতলায় বসে পথ চেয়ে আছেন তিনি। স্টেশনের গাড়িগুলো দেখা যায় এখান থেকে। থেমে থেমে যাত্রী নামিয়ে নবীনগরের দিকে ছুটে যাচ্ছে গাড়িগুলো। গাড়ি থামলেই তার মন বলে উঠে–'হয়তো হামযা এসেছে এবার।' কিন্তু তার মনের বিরুদ্ধে কাজ করে বাস্তবতা। হামযা আসে না।

স্টেশন থেকে গাঁয়ের পথ ধরে চলে যাচ্ছে শত শত পথচারি। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছেন সবাইকে। একজনকে হামযার মতো মনে হলো তার কাছে। গাঁয়ে পাঞ্জাবী, পরনে প্যান্ট, মুখে হালকা দাড়ি। আনন্দের ঢেউ খেলে যায় তার মনে। একটু নড়ে চড়ে বসেন তিনি। ভাল করে দেখার চেষ্টা করেন তাকে। না, হামযা নয়। সাঁকো পেরিয়ে সোজা চলে যাচ্ছে কাউইন্না মুড়ির দিকে। বিষাদে ছেয়ে যায় তার তনুমন। এমনি করে গড়িয়ে যায় দিন।

ছয়.

আগামীকাল ২১ ফেব্রুয়ারী। ভাষাসৈনিকদের মাঝে চলছে ধর্মঘটের ব্যাপক প্রস্তুতি। ২০ ফেব্রুয়ারীর দিন গড়িয়ে এলো রাত। সরকার বেসামাল হয়ে জারি করলেন ১৪৪ ধারা। ঢাকা শহরে একমাস বলবৎ থাকবে এ ধারা। বন্ধ থাকবে মিছিল, মিটিং, ধর্মঘট।

২১ ফেব্রুয়ারীর কুয়াশাঘেরা সকাল। আন্দোলনের তীব্র আগুন ছড়িয়ে পড়েছে সারাদেশে। হোকনা ১৪৪ ধারা। পাহাড় সমান বাধাও তাদের কাছে তুচ্ছ। মিছিলে মিছিলে ছুটে আসছে বিক্ষুব্ধ জনতা–'বাংলা উর্দু ভাই ভাই, উর্দুর পাশে বাংলা চাই', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, উর্দু বাংলায় বিরোধ নাই', '১৪৪ ধারা মানি না.....।

কাঁপিয়ে তুলছে ঢাকার রাজপথ। বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-মাদরাসা থেকে ছুটে আসছে আন্দোলিত ছাত্র জনতা। সমবেত হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায়। হামযাও নেতৃত্ব দিচ্ছে একটি মিছিলের। বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে হাজার হাজার জনতা। বেলা সাড়ে বারোটায় শুরু হয় সমাবেশ। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের শপথে উজ্জীবিত হয়ে উঠে দামাল ছেলেরা। চলতে থাকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রচেষ্টা। প্রতিবাদী শ্লোগানে প্রকম্পিত করে তুলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। বিক্ষুব্ধ জনতার উত্তাল গর্জনে কেঁপে উঠে শাসকের মসনদ।

শাসকগোষ্ঠী দিশেহারা হয়ে গুলি করার নির্দেশ দেয় পুলিশকে। নির্দেশ পেয়ে নির্বিচারে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও গুলি চালালো মিছিলের উপর। মাটিতে ঢলে পড়লো আবদুস সালাম, আবদুল জব্বার, রফিক, বরকতসহ আরো কেউ কেউ। হঠাৎ একটি গুলি এসে বিঁধলো হামযার বুকে। এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল তার বুক-পিঠ। তার পরপর আরেকটি গুলি এসে বিঁধলো তার মাথায়। মাটিতে ঢলে পড়লো হামযা। সেও শামিল হলে গেল রফিক, বরকতদের কাতারে।

মুহূর্তেই রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠলো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ভিজে স্যাঁত স্যাঁতে হয়ে উঠে সবুজ ঘাস। ইথারে ভাসতে থাকে রক্তের গন্ধ। লাল হরফে বদলে গেল বাংলা অক্ষরগুলো। অনন্ত ঠিকানায় চলে গেল হামযারা। চিরতরে ভুলে গেল মায়ের আদর, বোনের হাসি। ছেড়ে গেল পৃথিবীর সুখ-দুঃখ। বিনিময়ে দিয়ে গেল বাংলা ভাষার মর্যাদা। করে দিল রাষ্ট্রভাষা। বিশ্বের দরবারে পতপত করে উড়ছে তার পতাকা। ❐

বান্দার হকের জন্য

এক.

আ-চু-চু-চু-চু---আ-চু-চু-চু-চু---আয়-আয়-আয়। পোষা হাঁসগুলোর সন্ধান না পেয়ে খুব খারাপ হয়ে যায় জোহরার মা'র মন। সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথে খোয়ারে ফিরে তার হাঁসগুলো। কিন্তু আজ এখনও ফিরছে না। চারদিক আঁধারে ছেয়ে যাচ্ছে। অনেক্ষণ ডাকাডাকির পর তিনজোড়া হাঁসের মধ্যে মাত্র একজোড়ার সন্ধান পেল জোহরার মা। এই একজোড়া হাঁস নিয়েই বকবক করে ঘরে ফিরলো সে।

বর্ষাকাল। চারদিকে অথৈ পানি। জমিনে যেন পানি আর ধরে না। এ অথৈই পানির মধ্যে নকুল-ব্যাজি কিংবা অন্য কোনো হিংস্র প্রাণীর কবলে পড়ার কথা নয়। আবার এক সাথে চার চারটে। দু'জোড়া হাঁস এক সাথে গায়েব হওয়াতে খুব খারাপ হয়ে যায় জোহরার মা'র মন। ভীষন্নতার ছাপ পরিলক্ষিত হয় তার বৃদ্ধা চেহারায়। শোকে-তাপে কাটতে থাকে তার দিনগুলো।

এমনটি হওয়ারই কথা, খুব হাউস করে আদর ও যত্ন দিয়ে পোষে থাকে এসব প্রাণীগুলো। একটা নিবিড় সম্পর্ক ও হৃদ্যতা গড়ে উঠে প্রাণীগুলোর সাথে। তাছাড়া জোহরার মা খুব অসহায়। চারটি হাঁস তার জন্য অনেক কিছু। এর মধ্যে তিনটিই রোজ ডিম দেয়। এর দ্বারা কিছুটা শাক-সব্জির জোগান হয় তার। এখন এ পথও বন্ধ হয়ে গেল।

এরপর থেকে জামালের মা'র বকরী, আনোয়ারার মুরগী, আদম আলীর চারা গাছের নারিকেল, জুলায়খার গাছের পেঁপেসহ কত জনের কত কিছুই গায়েব হতে থাকে। রূপসাবাড়ির এমন অবস্থা চলতে থাকলে এলাকার মুরব্বীদের পরামর্শে যুবক শ্রেণীর ছেলেরা মিলে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিল। কিন্তু এতে আশানুরূপ সফল হতে পারলো না। কারণ সরিষায় ভূত থাকলে ভূত ছাড়াবে কিসে?

দুই.

কিছুদিন পরের কথা। শীতের সকাল। চারপাশ কুয়াশাচ্ছন্ন-অন্ধকার। বাদ ফজর লোকেরা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। কেউ কেউ এখনও শীতের কাঁথা জড়িয়ে আছে। হঠাৎ গ্রামের পশ্চিম দিকে চিৎকারের আওয়াজ শোনা গেল। ক্ষণিকের মধ্যেই ঘটনাস্থলে জড়ো হলো বেশ কিছু লোক। জানা গেল জনৈক দুধ ব্যাপারীর ব্যবসার টাকা নিয়ে উধাও হয়ে গেছে সাত/আটজন উচ্ছৃঙ্খল তরুণ-যুবক। তখন তাকে সান্ত্বনার বাণী শুনানো ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। সূর্য রশ্মি ছড়াতেই সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো এ দুঃসংবাদটি। গ্রামের সহজ-সরল মানুষ এ সংবাদ শুনে ব্যাপারী বেচারার জন্য অনুতপ্ত হয়।

আবিদপুরের এ দুধ ব্যাপারী প্রায়ই এ গ্রামের উপর দিয়ে চৌধুরী মার্কেট যায় ব্যবসার দুধ কিনতে। এরই মধ্যে ঘটে গেল এ অপ্রত্যাশিত ঘটনাটি। এ দুর্ঘটনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে সে। মাথায় হাত চলে আসে তার। মানুষের কাছে বিচার না পেয়ে আল্লাহর কোর্টে মামলা দায়ের করে সে। তার করুণ আর্জিতে আল্লাহর আলীশান আদালত পর্যন্ত কেঁপে উঠে।

তিন.

অন্য একদিনের ঘটনা। শীতের রাত। চারদিকে আবছা আঁধার। রাত ন'টা। এরই মধ্যে অনেকে বিছানায় গা এলিয়েছে। জমিনের বাঁকা পথ ধরে যাচ্ছিল বরযাত্রী। তারা ডিপকলের কাছে পৌঁছতেই আড়াল থেকে

কয়েকজন তরুণ-যুবক এসে বিয়ের সরঞ্জামাদি, মেয়েদের গয়না ইত্যাদি নিয়ে গেল। একরকম শকুনের মত ছোঁ মেরে নিয়ে গেল এসব জিনিসপত্র। রাতের আঁধারে কে কার নাগাল পায়। ঐ দিন বরযাত্রীদের মনে কত কষ্টই না পেয়েছিল এবং বিয়ে অনুষ্ঠানে কি অসুবিধাটাই না হয়েছিল একমাত্র ভূক্তভোগীরাই তা বুঝতে পারবেন।

পরপর কয়েকটি ঘটনা ঘটে যাওয়ায় বিষয়টি গ্রামের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের ভাবিয়ে তুললো। কিন্তু তথ্য-তালাশ না পেয়ে ঘটনার কোনো বিহিত করতে পারলেন না। তবে আলিমুল গায়েব, আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো বিষয়ই অজানা নেই। তিনি জগতের সবকিছু দেখেন, শুনেন। এমনকি গভীর মহাসমুদ্রের তলদেশে বিচরণকারী মিচমিচে কালো পিপিলিকাকেও তিনি দেখেন এবং তার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। কিন্তু তিনি তাৎক্ষণিকভাবে কাউকে পাকড়াও করেন না, বরং বান্দাদেরকে ভাল হওয়ার সুযোগ দেন।

বান্দা যদি সুযোগ গ্রহণ না করে তখন তিনি পাকড়াও করেন। হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক আদায় করা বান্দার উপর ফরজ। কেউ যদি তা আদায় না করে থাকে, তাহলে সে কঠোর শাস্তির উপযুক্ত হবে। মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তা ক্ষমাও করে দিতে পারেন। কিন্তু হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক বিনষ্টকারীকে তিনি ক্ষমা করবেন না। বান্দার হক আদায় করে দিলে এবং বান্দার পক্ষ থেকে মাফ চেয়ে নিলে, অতীতের কৃতকার্যের উপর অনুতপ্ত হলে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ না করার ওয়াদা করে তাওবা করলে তবেই আল্লাহ তাআলা মাফ করতে পারেন। বান্দার হক আদায় করে না গেলে বিচার দিবসে এর পরিবর্তে স্বীয় নেক আমাল দিয়ে দিতে হবে।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পাশে উপবিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে বললেন–তোমরা জানো কি গরীব কে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন–আমাদের মধ্যে তো গরীব তাদেরকে বলা হয়, যাদের কাছে ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা না থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–প্রকৃত পক্ষে আমার উম্মতের মধ্যে

সবচেয়ে বড় গরীব সে, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত সবকিছু নিয়ে উঠবে, কিন্তু তার এ কর্মগুলোও থাকবে যে, সে দুনিয়াতে কারো সাথে মন্দ আচরণ করেছে, কারো নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কাউকে আঘাত করেছে, কাউকে খুন করেছে ইত্যাদি, তাই এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তার কিছু নেকী একে দিবে, কিছু নেকী ওকে দিবে। এভাবে দিতে দিতে বান্দার হক আদায়ের পূর্বে যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তাহলে এই হকদারদের গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম শরীফ)

তিনি আরো ইরশাদ করেন–হিসাব-নিকাশের দিন সকলের প্রাপ্য আদায় করতে হবে। এমনকি শিংবিশিষ্ট বকরী থেকে শিংবিহীন বকরীর পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। (মুসলিম শরীফ)

এ ব্যাপারে তিনি এতটা কঠোর হয়েছেন। কারণ তা হচ্ছে বান্দার কষ্টোপার্জিত সম্পদ। এ সম্পদ বিনষ্ট হলে তাদের অন্তরে দারুণ আঘাত হানে। হক্কুল ইবাদ বিনষ্ট করার দরুণ আল্লাহ তাআলার আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠে।

চার.

রূপসাবাড়ি থেকে তিন কিলোমিটার দক্ষিণে মেইন রোড থেকে পশ্চিম দিকে চলে গেছে আঁকাবাঁকা সলিংয়ের রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে ঘন ঘন কাঠ গাছ। দিন দুপুরেই রাস্তাটি আঁধারে ছেয়ে থাকে। দু'পাশে ফসলের জমি, আশেপাশে কোনো বাড়ি-ঘর নেই। সলিংয়ের রাস্তার একটু পরে ফরিদুদ্দীন কলেজ। কলেজ টাইম ছাড়া লোকজনের তেমন আনাগোনা থাকে না। জমিনের উপর দিয়ে তাকালে ঝাঁপসা দেখা যায় দূরের গ্রামগুলো। ঐ গ্রামের লোকজন প্রয়োজনে এ রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করে।

কালো রাত। ঈদের ছুটিতে বাড়ি ফিরছে এক ভদ্রলোক। সলিংয়ের রাস্তা বেয়ে ক্ষাণিকটা সামনে এগুতেই তার চলার গতি বন্ধ হয়ে আসে। তার পথ আগলে দাঁড়ায় কয়েকজন যুবক–'কি আছে শালা বের কর, নইলে ভূঁড়ি ফালাইয়া দিমু।, প্রাণের মায়ায় কিছু বলেননি ভদ্রলোক। যুবকরা রেখে দেয় তার মোটা অংকের টাকা এবং দামী ঘড়ি। ভদ্রলোক ছিলেন নৌবাহিনীর

সদস্য। সাধারণ পোশাকের দরুণ ওরা তাকে চিনতে পারেনি। ভদ্রলোক এ ব্যাপারে থানায় জিডি করলেন। পরদিন থেকে এখানে টহল দিতে থাকে পুলিশ।

পাঁচ.

কিছুদিন পরের কথা। পবিত্র মাহে রমজান। ঈদুল ফিতর সমাগত। ঈদের মাত্র চারদিন বাকি। তিমির রাত। লোভে লোভে যুবকগুলো আবার গিয়ে হাজির হলো ফরিদুদ্দীন কলেজের কাছে। সংখ্যায় আগের চেয়ে বেশি। রাত তখন সাড়ে ন'টা। ওরা শিকারের জন্য অপেক্ষমান। একটু একটু ভয়ও হচ্ছে ওদের। এক সময় পূর্বদিক থেকে একটি টেক্সী আসার শব্দ শোনা গেল। রাস্তার উপর প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়ালো কয়েকটি যুবক। সামনে আসতেই ও হাত উঁচু করে বললো–'টেক্সী থামা, কেউ নামার চেষ্টা করবি না, জানের মায়া থাকলে কি আছে সব বের করে দে।' টেক্সী যাত্রী-রা কাতর সুরে বললো–'ভাই আমরা গরীব মানুষ, আমাদের কাছে কিছু নেই। আমাদেরকে জানে মারবেন না। পেছনে মাইক্রো যোগে একটি বিদেশী পার্টি আসছে।' যুবকগুলো তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে বিদেশী পার্টির অপেক্ষায় রইলো।

টেক্সীযাত্রীরা ছিল ছদ্মবেশী পুলিশ। তারা একটু দূরে গিয়ে তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী অপর গ্রুপের কাছে মোবাইল করে দিল। দ্বিতীয় গ্রুপ কল পাওয়া মাত্র যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ঘটনাস্থলে রওনা করলো। মাইক্রোটি সামনে আসতেই যুবকদের ভাষ্য–'জানের ভয় থাকলে আর এক চুলও সামনে বাড়বি না, কি আছে.....।' যুবকদের কথা শেষ না হতেই চারদিক থেকে ঘেরাও করে দু'জনকে ধরে ফেললো ট্রেনিংপ্রাপ্ত পুলিশগ্রুপ। হাতের পিস্তল দিয়ে আঘাত করে একজন ছুটে গেল। আর বাকিরা আগেই পালিয়েছে। আটককৃত যুবকের নাম বশির। জিদের বশবতী হয়ে তাকে আচ্ছা করে পিটুনি দিল পুলিশ। চৌদ্দ-পনের জনের মার খেল সে একাই। যাকে বলে পুলিশের ডাণ্ডা পিটুনি। তাকে নিয়ে যাওয়া হলো থানায়। পিটুনি খেয়ে ঘটনার সাথে জড়িত সবার নাম বলে দিল বশির। সেই হাঁস-মুরগী

থেকে শুরু করে আজকে পর্যন্ত ঘটনার সাথে জড়িত সবার নাম বলে দেয় যে। থানায় এন্ট্রি করা হলো সবার নাম-ঠিকানা। সরকারবাদী মামলা হলো তাদের নামে। অবস্থা বেগতিক দেখে বশিরকে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলো। পরে জেলা সদরে স্থানান্তর করা হয়। কারণ পিটিয়ে তার হাড়-গোড়, কল-কব্জা গুঁড়ো করে ফেলে পুলিশ। হাড়-গোশত একাকার করে ফেলে তারা। এবড়ো থেবড়ো করে ফেলে মুখমণ্ডল। 'বাইচ্যা থাকলেও উইঠ্যা চাইলের ভাত খুইট্যা খাইতে পারবে না।'

ছয়.

বশিরের বাবা তার পেছনে থানায় ঢালতে থাকে অঢেল টাকা। তারপরও হাসপাতালে গিয়ে তার সাথে দেখা করার অনুমতিটুকু দেওয়া হচ্ছে না। বাণ্ডেলে বাণ্ডেলে খরচ হচ্ছে টাকা। প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো অসুবিধা হয়নি। কারণ বশিরের বাবা লাখ লাখ টাকার মালিক। কিন্তু পরবর্তিতে দেখা গেল লাখ লাখ টাকা ঢেলেও ঘটনার কোনো বিহিত করতে পারছে না। তখন তাদের মাথায় হাত উঠে আসে। ইতোমধ্যে বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে বেশ ক'জন আসামী গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের সাথে অনেকের পিতা-ভাই, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনদেরও গ্রেফতার করা হয়। কথায়ই তো আছে– 'একজনের পাপে দশজন ফাঁপে'।

ঈদুল ফিতরের আনন্দ তাদের কপালে জুটেনি এবার। আত্মীয় স্বজনদের শোকে তাপে এর কিছুই অনুভব হয়নি তাদের। তারাও স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের পেছনে খরচ করতে থাকে প্রচুর টাকা-পয়সা।

এক পর্যায়ে জমি-জমা বিক্রির পর ঘরের ভিটি পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে তাদের। একদম সহায়-সম্বলহীন হতে হয়েছে কেউ কেউ। রাস্তার ফকির সাজতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। তারপরও ঘটনার কোনো কিনার করা যায়নি। মুক্ত করা যায়নি তাদের। পঁচতে থাকে তারা কারাগারের চার দেয়ালের ভেতর। আবার কেউ কেউ বাড়ি-ঘর ছেড়ে কাটাতে থাকে ফেরারী জীবন। শুধুই বান্দার হকের জন্য। ❐

মায়ের ভালবাসা

এক.

গরীব পরিবারের ছেলে নাদীম। বয়স দশ-এগার। সে গাঁয়ের মাদরাসার চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। ছাত্র হিসেবে মোটামুটি ভাল। নিয়মিত মাদরাসায় যায় সে। সকাল দশটায় ক্লাস শুরু হয় তার, ছুটি হয় সেই চারটায়। ছুটির পঁচিশ-ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই সে বাড়িতে ফিরে আসে।

সকালের 'কড়কড়া' ভাত খেয়ে আজ নয়টার মধ্যেই মাদরাসায় পৌঁছে নাদীম। সারাদিন মাদরাসা করে যথাসময়ে বাড়িতে ফিরেনি আজ। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বেজে গেছে, এখনও ফিরছে না সে। সেই চারটার পর থেকে দিশেহারা হয়ে খুঁজতে থাকেন তার মা। ঘরে বাইরে কোথাও বসছে না তার মন। একবার যায় পুকুর পাড়ের তেঁতুল গাছতলায়, একবার অজিন পুকুরের রাস্তায়, একবার গাবতলীতে। এভাবে পেরেশান হয়ে খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন তিনি। কিন্তু কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না তাকে।

দুই.

একসময় অপরাধের কথা ভাবতে ভাবতে গাঁয়ের পথ ধরে আসছে নাদীম। বাড়ির পাশের গোদারার নৌকা না পেয়ে জামা-কাপড় ভিজিয়েই পেরুলো বড় খাল। সামান্য একটু হেঁটে গোপাটের কাছে পৌঁছতেই তার সমবয়সী একটি মেয়ে তাকে বললো–'তোমার আম্মা তোমারে খুঁজতে

খুঁজতে পাগল অইয়া গেছে, তুমি সারেদিন কই আছিলা, তোমার আম্মা তোমারে আজকা মারবো.....।'

নাদীম জানে তার মা যেমন আদর করে, কোনো অপরাধ দেখলে তেমন শাসনও করে। এমনিতেই সে ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরছিল, তার উপর মেয়েটির কথা শুনে তার মনের ভয় আরো গাঢ় হয়ে উঠলো। তাই সে আর ঘরে ফিরেনি।

তিন.

পাগলপারা হয়ে খুঁজতে থাকেন তার মা। নাদীমের বাবা বেঁচে নেই। তিনি থাকলে এদিক ওদিক গিয়ে খোঁজখবর নিতে পারতেন। নাদীমের মা মহিলা মানুষ কোথায় আর যেতে পারেন। তারপরও এদিক ওদিক অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছেন তিনি। লোকদের মাধ্যমে খোঁজখবর নিয়েছেন বিভিন্ন স্থানে। যাকে সামনে পান তাকেই জিজ্ঞেস করেন নাদীমের কথা। কেউ দিতে পারে না তার সন্ধান। খুব পেরেশান হয়ে পড়েন তিনি। বেদনায় নীল হয়ে যায় তার দেহমন। শোকে কাতর হয়ে পড়েন তিনি। বুক ফেটে চৌচির হয়ে যায় তার। ছিঁড়ে যায় মর্মের বত্রিশ বাঁধন। 'নাদীম বাবা তুই কই, বাবা তুই কই, আমার কোলে ফিরে আয় ইত্যাদি' বলে চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন তিনি। নাদীম নাদীম বলে ডাকতে থাকে তার প্রিয় সমবয়সীরা। কোনো পাত্তা নেই তার, সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কারো ডাকের।

এদিকে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে রাত। পড়শীরা ফিরে যায় নিজ নিজ ঘরে। ছেলেকে ছাড়া ঘরে যেতে মন চায় না নাদীমের মার। আলমের দাদী ও অন্য মুরব্বীরা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন তাকে, বলেন ধৈর্য ধারণ করতে। কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে তার। ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকেন তিনি। একসময় বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনো রকমে ঘরে নিয়ে আসেন তাকে।

চার.

রাজ্যের অন্ধকার নেমে আসে পল্লীজুড়ে। নীরব নিস্তব্ধ রজনী। কোনো জনমানবের সাড়া শব্দ নেই। ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে সারা পল্লী।

নাদীমের ছোট বোন নাদিয়াও ঘুমিয়ে পড়েছে অনেক আগে। ঘুম নেই শুধু নাদীমের মা'র চোখে। ইথারে ভাসছে নাদী-ম নাদী-ম ডাকগুলো। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিচ্ছে ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা শব্দ। সদর রাস্তা কাঁপিয়ে শাঁ শাঁ ভেঁপু শব্দ করে চলে যাচ্ছে মালবাহী ট্রাক। টুপ টুপ কুয়াশা পড়ছে টিনের চালে। কিচির মিচির করে রাতের প্রহরের বার্তা জানিয়ে দিচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু পাখি। ডানা ঝাঁপটিয়ে এক বৃক্ষ থেকে অন্য বৃক্ষে উড়ে যাচ্ছে ক্ষুধার্ত পাখিগুলো। ঝাউ গাছের মগডালে ভেংচি কেটে ডেকে যাচ্ছে হুতোম প্যাঁচা। দূর থেকে ভেসে আসছে শিয়ালের হুক্কাহুয়া ডাক। সব মিলিয়ে বিদঘুটে ও ভয়ানক হয়ে উঠলো রাতটি। একদিকে ভয়ার্ত রাত অন্যদিকে পুত্রশোক নাদীমের মায়ের উপর গাঢ়ভাবে জেঁকে বসলো। অকস্মাৎ গা-টা শিন শিন করে উঠে তার। দাঁড়িয়ে যায় শরীরের লোমকুপ। ঝাঁকুনি মেরে উঠে উপবাসী বদনটা।

সারাদিন কোনো দানাপানি মুখে দেননি তিনি। নাদীম মাদরাসা থেকে ফিরলে যা যোগাড় হয় তাকে নিয়ে একসাথে খেতে বসেন প্রতিদিন। নাদীমকে ছাড়া কোনো কিছু মুখে যায় না তার। কেউ কিছু দিলে নাদীমের জন্য গুঁজে রেখে দেন তা। তাদের অবস্থা এমন ছিল না। সচ্ছলতার সাথেই দিন কাটছিল তাদের। নাদীমের বাবা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর তারা হালে দুর্বল হয়ে পড়েন। তারপরও নাদীম ও নাদিয়াকে কষ্ট পেতে দেন না তিনি। নিজে না খেয়ে তাদেরকে খাওয়ান। স্বামী মারা যাওয়ার পর তাদের দিকে চেয়েই দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন তিনি। আদর-সোহাগ দিয়ে সব সময় কাছে আগলে রাখেন তাদেরকে।

পাঁচ.

আজ একটুর জন্যও বিছানায় গা লাগেনি তার। থেমে থেমে হৃদয় চিরে বেরিয়ে এসেছে পুত্রশোকের করুণ কান্না। একসময় মিনার চুড়ে ভেসে আসে ফজরের আজান–আসসালাতু খাইরুম মিনান্নাউম....। আড়মোড়া দেয় নামাযী বান্দারা। অজু-ইস্তেঞ্জা সারতে বাইরে যায় নাদীমের মা। তখন ঘরের পেছনে ঘুমন্ত অবস্থায় নাদীমকে পেয়ে 'বাবা' বলে চিৎকার দিয়ে বুকে

জড়িয়ে ধরেন তাকে। নাদীমও 'আম্মা' বলে চিৎকার মেরে জড়িয়ে ধরে মা'র গলা। তাদের চিৎকার শুনে বেরিয়ে আসে কয়েকজন পড়শী মহিলা।

ভয়ে চুপসে গেছে নাদীম। সে তাদের ঘরের পেছনে খড়ের উপর ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভয়ে ঘরে যায়নি সে। মশা কামড়িয়ে দাগ করে ফেলেছে তার সুন্দর মুখবয়ব। খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে সে। একেতো সারাদিন সারারাত খাওয়া নেই, আবার পৌষের কনকনে শীত, তার উপর জামা কাপড় ভেজা। সব মিলিয়ে একদম জড়সড় হয়ে পড়ে সে।

পাশের গাঁয়ে ষাড় দৌড় খেলা হয়েছিল। সহপাঠীদের কথায় তাদের সাথে ষাড় দৌড় দেখতে গিয়েছিল সে। কোনো কোনো এলাকায় ঘোড় দৌড়ের মতো ষাড় দৌড়েরও আয়োজন করা হয়। গাঁয়ের সৌখিন গিরস্তরা তাদের মোটাতাজা ষাড় নিয়ে হাজির হয় দৌড়ের মাঠে। হাজার হাজার দর্শকের সমাগম হয় সেখানে। গাঁও-গেরামের লোকেরা সাগ্রহে উপভোগ করে সেই খেলা।

নাদীমের গা-গতর ধুইয়ে ঘরে তুলে নেন নাদীমের মা। সব বেদনা মধুর হয়ে উঠে তাকে পেয়ে। ফিরে পায় কলিজার টুকরা আকাশের চাঁদ। তৃপ্তিতে ভরে উঠে তার দেহমন। জুড়িয়ে যায় মা'র শোর্কাত —— হৃদয়। ❐

মাতব্বরের দাপট

এক.

মেইন রোডের পশ্চিমে সোনালীপাড়া গ্রাম। মেইন রোড থেকে পশ্চিম দিকে চলে গেছে উঁচু কাঁচা রাস্তা। রাস্তার বাম পাশে বড় খাল, ডান পাশে একটু পরপর নতুন নতুন বাড়ি। তাছাড়া রাস্তার দু'পাশে রয়েছে ফসলের জমি। এ রাস্তা বেয়ে দশ মিনিট হেঁটে বাঁশের সাঁকো পেরুলেই সোনালী-পাড়া গ্রাম। আশপাশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল তার সুনাম-সুখ্যাতি। সোনালীপাড়ার সোনালিত্ব এখন আর নেই। তা ক্ষুন্ন হয়েছে কিছুসংখ্যক গ্রাম্য মাতব্বরের কারণে।

দুই.

সোনালীপাড়ার এমনি একজন মাতব্বর লিয়াকত গাজী। তার গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, জমিনভরা ফসল, গ্রামভরা আত্মীয়-স্বজন। টাকা-পয়সা, সহায়-সম্পত্তি কোনো কিছুর অভাব নেই তার। কলমখানা সাতবার তুলে কোনো রকমে নামখানা দস্তখত করতে পারেন। এতেই তিনি গ্রামে মাতব্বরী করে বেড়ান। গ্রামের যে কোনো মেল-দরবারে, বিচার-আচারে তাকে হাজির থাকতেই হবে। তিনি হাজির না হলে দরবারই যেন জমে উঠে না। তা হলে কি হবে, তার বিচারে জঘন্যতম অপরাধীরাও পার পেয়ে যায়। সাজা হয় নিরপরাধীদের। এর সবই হয় ঘুষের বলে। কাম্যমানের বিচার না পেয়ে সবাই ভাঙা হৃদয়ে ফিরে যায় আপন আপন নীড়ে। সাহস করে কেউ কোনো কথা বলতে পারে না লিয়াকত গাজীর সামনে। সবাই থরথর করে

কাঁপে তার ক্ষমতার দাপটে। মোটা অংকের ঘুষ পেয়ে একের জমি, বাড়ি অপরের নামে দলিল করে দেন তিনি। বড় ধরনের অপরাধ করেও পার পেয়ে যেতে পারে তার বিচারে।

তিন.

জুলুমবাজির অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে তার মাতব্বরীর জীবনে। এই তো সেদিন জেবুন্নেসা বেগমের পনের শতক জমি দলিল করে দেন পার্শ্ববর্তী জমির মালিক সেলিম খানের নামে। বছর পাঁচেক আগে জেবুন্নেসা বেগমের স্বামী মারা যায়। মৃত্যুর সময় পনের শতক জমির সাথে দুই ছেলে দুই মেয়ে রেখে যায়। তা থেকে যা পেত তা দিয়েই চার সন্তান নিয়ে কোনো রকমে দিন কাটাতো অসহায় জেবুন্নেসা বেগম। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার খরচসহ যাবতীয় খরচ এর দ্বারাই বহন করতে হত। এছাড়া দ্বিতীয় কোনো আয়ের উৎস ছিল না তার। এর দ্বারাই সন্তানদের নিয়ে সুখের স্বপ্ন দেখছিল জেবুন্নেসা বেগম। তা দুঃস্বপ্নে পরিণত করে দিলেন লিয়াকত গাজী। জেবুন্নেসা বেগমের বুক চিরে বেরিয়ে আসে করুণ চিৎকার। মজলুমের আর্তনাদে ভারি হয়ে আসে আকাশ-বাতাস। আল্লাহর আরশে আজীম পর্যন্ত কেঁপে উঠে তার করুণ আর্তনাদে। আল্লাহ তাআলা কবুল না করে পারেন না জেবুন্নেসা বেগমের ফরিয়াদ।

চার.

লিয়াকত গাজীর ঘোড়শী কন্যা রোখসানা সবেমাত্র হাইস্কুলের সীমানা পেরিয়ে কলেজের আঙ্গিনায় পদার্পন করেছে। ভর্তি হয়েছে বদিউল আলম কলেজে। বদিউল আলম কলেজ সোনালীপাড়া থেকে ছয় কিলোমিটার দক্ষিণে। শুরু হয় রোখসানার কলেজে আসা যাওয়া। কলেজ থেকে প্রায়ই রাত করে বাড়ি ফিরে রোখসানা। কলেজ কিংবা কলেজপাড়ার বখাটে যুবকদের সাথে হাসি-তামাশা করতে দেখা যায় তাকে। সিনেমা থেকে শুরু করে যতসব জায়গায় আসা যাওয়া শুরু হয় তার। এমনি করে একদিন অপকর্মে ধরা পড়ে রোখসানা। লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে বিষয়টা। আশপাশের গ্রামগুলোতেও জানাজানি হয়ে যায় তা। পরপর কয়েকবার অপকর্মে ধরা পড়ে লিয়াকত গাজীর মেয়ে। কিন্তু এ ব্যাপারে তার মুখোমুখি হওয়ার সাহস নেই কারো।

এদিকে মেয়ের ব্যাপারে লিয়াকত গাজী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। কি করবেন ভেবে পান না তিনি। অতিদ্রুত একজন পাত্র দেখে বিয়ের ব্যবস্থা করলেন তার মেয়ের। ছেলে চাকরি করে। সে থাকে নিজের কর্মস্থলে। রোখসানা বাপের বাড়িতে থেকে মাঝে মধ্যে কলেজে আসা যাওয়া করে। এই একটি বছর কেটে যায় বিভিন্ন প্রকার ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে। একসময় ফুটফুটে একটি নিস্পাপ সন্তান হয় রোখসানার। স্বামী ছুটিতে আসা যাওয়া করে রোখসানার কাছে।

পাঁচ.

কয়েক মাস পরের ঘটনা। কলেজ করতে গিয়ে আবার ধরা পড়ে মাতব্বরের মেয়ে। ধরা পড়ে জঘন্যতম যিনা-ব্যভিচারে। তথাপিও লিয়াকত গাজীর ভয়ে মুখ খুলতে সাহস করে না কেউ। এলাকার আবদুল হাকিম সাহেবের ছেলে মাহমুদ এবার দাওরায়ে হাদীস পাশ করে দেশে ফিরেছে। সে জানে 'জালিম শাসকের সামনে উচিত কথা বলা উত্তম জিহাদ।' সে প্রথমে ঘটনার সত্যতা যাচাই করে নিল। পরে লিয়াকত গাজীর মুখোমুখি হলো তার কন্যা রোখসানার ব্যাপারে। তার সাথে শামিল হলেন গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও। গ্রামবাসীর প্রাণের দাবি–'আমরা মাতব্বরের মেয়ের কারণে লোকসমাজে মুখ দেখাতে পারি না। এর একটা বিহিত করতেই হবে। আমরা এর সুষ্ঠু সমাধান চাই।'

গ্রামবাসীর প্রাণের দাবি আদায় করতে গিয়ে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে গ্রাম্য সালিশ অনুযায়ী দোররা মারা হয় লিয়াকত গাজীর মেয়েকে। লিয়াকত গাজী গ্রামবাসীর কাছে ক্ষমা চান মেয়ের কৃতকর্মের জন্য। এত দিনে ছাড়ানো হয় সরষের ভূত। গ্রামবাসী মাহমুদকে প্রাণভরে দোয়া করে। মুবারকবাদ জানায় তার সাহসিকতার জন্য। অনেক দিন পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো গ্রামবাসী। লিয়াকত গাজীর জামাতা এ ঘটনা জানতে পেরে রোখসানাকে তালাক দিয়ে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে দেয়। ধীরে ধীরে খাটো হয়ে আসে লিয়াকত গাজীর মাতব্বরীর পা। বন্ধ হয়ে আসে দু'চোখ। এখন আর উজ্জ্বল মুখখানা দেখাতে পারেন না লোকসমাজে। মাতব্বরের দুলালীকে কাটাতে হচ্ছে স্বামীহারা জীবন। লিয়াকত গাজীকে ভোগ করতে হচ্ছে পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ❐

একটি জন্মনিয়ন্ত্রণের পরিবার

এক.

শ্রাবণ মাস। জুমা বার। ফজর থেকেই শ্রাবণের ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ক্ষণিকের জন্যও থামেনি, শুধু গেয়েই চলেছে তার বর্ষণের সঙ্গীত। দিনমান সূর্যের চেহারাটুকু দেখা যায়নি। একটানা বৃষ্টি হয়ে বিকেলের দিকে থামলো বর্ষণের সুরতরঙ্গ। এ যেন সারাদিনের বিশ্রাম। এই সুবাদে সূর্যটা পশ্চিমাকাশে চুকি মারলো। এর একটু পরই সন্ধ্যা নেমে এলো।

ঘড়ির কাঁটা সাতটার ঘর ছুঁই ছুঁই। চারদিকে অনেক পূর্বেই সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠেছে। শহরের মনোরম পরিবেশে অবস্থিত 'স্নেহের পরশ কমিউনিটি সেন্টার।' চারপাশ আলোকসজ্জায় সজ্জিত। প্রবেশদ্বারে ডেকোরেটর তৈরি মনাকর্ষক গেইট। এমনটি হওয়ারই কথা। চাঁদপুর শহরের বিশিষ্ট শিল্পপতি শহীদুজ্জামান। তার একমাত্র কন্যা ফাওজিয়া জামান। আজ তার বিয়ে। সে গত বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ পাশ করেছে। অল্পের জন্য সেকেন্ড ডিভিশনটি হারায়নি।

ইতোমধ্যে কমিউনিটি সেন্টারের সামনে দু'ডজন মাইক্রো এসে থামলো। বরযাত্রী এসেছে। আগত কচি-কাঁচাদের মধ্যেও তার রব। বিশিষ্ট বিজনেসম্যান আতাউর রহমান চৌধুরী দুই পুত্র এক কন্যা নিয়ে ঢাকায় থাকেন। প্রথম পুত্র ব্যারিস্টার আশিকুর রহমান চৌধুরী। সে এবার ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে দেশে ফিরেছে। তার সাথেই ফাওজিয়া জামানের বিয়ে। দ্বিতীয় পুত্র মাওলানা সাজিদুর রহমান চৌধুরী। সে গত

বছর দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে হাদীসশাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরেছে। বর্তমানে রাজধানীর একটি বড় মাদরাসার হেড মুহাদ্দিস। আর এক কন্যা জাকিয়া রহমান, এবার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীনী।

দুই.

কমিউনিটি সেন্টারে বিয়ের কথা শুনে মাওলানা সাজিদ চৌধুরী আসতে চায়নি। পরে অনেক পীড়াপীড়ির পর আসতে বাধ্য হয়েছে। মাইক্রো থেকে নেমে বিয়ে অনুষ্ঠানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণ দেখে সাজিদ চৌধুরীর ভ্রু ললাটে ওঠার উপক্রম। ক্ষোভে কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারেনি। এমনটি হওয়ার কথা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

ইতোমধ্যে খাওয়া-দাওয়া ও বিয়ের কাজ মিটে গেছে। বিয়েতে মহরানা দুই লাখ ও কনের পক্ষ থেকে দুই লাখ বিশ হাজার টাকা এবং টিভি, ফ্রিজ, ফার্নিচার ইত্যাদি যৌতুক হিসেবে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাজিদ চৌধুরী তার প্রতিবাদ করে। কারণ বিয়েতে অধিক পরিমাণ মোহর ধার্য করা ঠিক নয় এবং কনের পক্ষ থেকে যৌতুক গ্রহণ করা জায়িয নয়। কিন্তু সে তার বাবার কারণে কিছুই করতে পারেনি। প্রতিবাদে কোনো ফায়দা হয়নি। বিয়ের শেষে সেদিনই কনে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়।

তিন.

বিয়ের পাঁচ বছর পর্যন্ত আশিক চৌধুরীর কোনো সন্তান হয়নি। তার বিয়ের দু'বছর পরই সাজিদ চৌধুরী বিয়ে করেছে। তার একটি পুত্রও হয়েছে। সাজিদ চৌধুরীর স্ত্রী নুসরাত সাদিয়া শামসুল আলম সাহেরের তৃতীয় কন্যা। তিনি একজন কোটিপতি। সিরাজগঞ্জ পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান। পরিবার নিয়ে সেখানেই থাকেন। তার মূল বাড়ি কুমিল্লার মুরাদনগরে। সেখানে তেমন একটা যাওয়া হয় না। নুসরাত সাদিয়া কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ পাশ করে বেরিয়েছে। ছাত্রী হিসেবে খুব ভাল ছিল। রূপলাবণ্যেও কমতি নেই, যাকে বলে অতুলনীয়া। যেন সকল গুণের সমাবেশ ঘটেছে তার মধ্যে। অনেকেই প্রেমপত্র দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে।

বড় ভাই আশিক চৌধুরীর কোনো সন্তান না হওয়ার ব্যাপারটা সাজিদ চৌধুরীকে ভাবিয়ে তুললো, সাথে সাদিয়াকেও। ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে জানতে না পারলেও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষাণিকটা আঁচ করতে পেরেছিল। সম্ভবত এখন তারা সন্তান নেবেন না। সাজিদ চৌধুরীর কাছে কোনো বিষয় অস্পষ্ট থাকতে পারে না, সে একজন শিকড়সন্ধানী মানুষ, যে করে হোক এর মূল কারণ উদঘাটন করবেই। এর বছরখানেক পর আশিক চৌধুরীর একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হলো। নাম ফারিহা আশিক চৌধুরী। সবাই তার খুব যত্ন নেয়।

তারা যে এতদিন ইচ্ছে করে সন্তান নেয়নি, ফারিহার জন্মের পর সাজিদ চৌধুরীর কাছে তা পরিষ্কার হয়ে গেল। তবে সে ব্যাপারে তাদেরকে কিছু বলতে চেয়েও বলেনি। কিছুদিন হলো আশিক চৌধুরীর একটা চাকরি হয়েছে। দুই ভাই খুব মিলেমিশে থাকে। স্ত্রীদের মধ্যেও খুব ভাব। সাদিয়া তো ফাওজিয়াকে বড় বোনের মতোই শ্রদ্ধা করে। এভাবে কেটে যায় দু'টি বছর। সাজিদ চৌধুরীর আরো একটি পুত্রের জন্ম হয়।

চার.

ফাওজিয়া আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা। তার পেটে সন্তান। বারান্দার বেঞ্চে দুই জাঁ আলাপচারিতায় মশগুল। ননদ জাকিয়া পাশেই সাজিদ চৌধুরীর নবজাতককে দোলনায় দুল খাওয়াচ্ছে। কথা হচ্ছিল ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে। একপর্যায়ে জাকিয়া চলে গেলে ফাওজিয়া জামান বললো : আমরা দুটো'র পর আর সন্তান নেব না।

নুসরাত সাদিয়া : (লজ্জাবনত হয়ে) আর নেবেনই না। নাকি আপাতত নেবেন না?

: আর নেবই না।

: এটা কি আপনার একার অভিমত না দু'জনেরই?

: দু'জনেরই।

নুসরাত সাদিয়া তার অবৈধতা সম্পর্কে কিছু জেনেও তৎক্ষণাৎ কিছু বলতে পারেনি। লজ্জায় ও শ্রদ্ধায় তার মস্তক অবনত হয়ে আসে।

এদিকে মসজিদের মিনার চুড়ে ভেসে আসে আছরের আজান। নুসরাত সাদিয়া নামায আদায় করতে উঠে পড়ে। ফাওজিয়া জামান স্রেফ শাড়ির আঁচলটা শিরে তুলে দেয়।

পাঁচ.

সপ্তাহখানেক পর সাজিদ চৌধুরী বাড়িতে এসেছে। দিনে সাদিয়ার ফুরসৎ মিলেনি। রাতে শুতে গিয়ে স্বামীকে জানালো ফারিহার মা'র কথা। জানাতে চায়নি, অনেক ভেবেচিন্তে উপকারের প্রতি লক্ষ্য করে জানাতে বাধ্য হয়েছে। স্ত্রীর কথা শুনে সাজিদ চৌধুরী বুকভরা হতাশা নিয়ে বললো–এ ব্যাপারে তুমি কিছু বলোনি।

নুসরাত সাদিয়া : বলতে চেয়েও সাহস করে কিছু বলতে পারিনি, তাছাড়া আপনার অনুমতি ছাড়া বলি কী করে?

সাজিদ চৌধুরী : আমি ভাবীকে কিছু বলবো না। তুমিই বরং কিছু বলো। আর আমি ভাইজানকে কিছু বলার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।–এই বলে দু'জনে ঘুমিয়ে পড়লো।

ইসলামী শরীয়তে পরপুরুষের সাথে দেখা দেওয়া জায়িয নয়। তাই নুসরাত সাদিয়া কোনো পরপুরুষের সাথে দেখা দেয় না। ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলে সে। তাছাড়া সে স্বামীর খুব অনুগত। তার ভালবাসাকেই হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান দিয়েছে।

ছয়.

একদিন দুই ভাই ঘরের মেঝেতে সকালের নাস্তা খেতে বসলো। নাস্তা শেষে আশিক চৌধুরীকে উঠে যেতে দেখে সাজিদ চৌধুরী আদবের সাথে একটু বসতে বললো। সাজিদ চৌধুরীর কথায় দুই ভাই মেঝে থেকে উঠে খাটে গিয়ে বসলো। 'আপনার সাথে দুটো কথা বলবো'–বললো সাজিদ চৌধুরী।

'ঠিক আছে কী বলবি জলদি বলে ফেল। আজ আমার মর্নিং অফিস'–বললো আশিক চৌধুরী।

: আমার পক্ষে আপনার সাথে এসব বিষয় নিয়ে আলাপ করা মোটেই সমীচীন নয়, তবুও ইসলামের খাতিরে বলতে হয়। ই-য়ে মা-মানে শুনলাম আপনারা নাকি আর সন্তান নেবেন না?

: হ্যাঁ তুই ঠিকই শুনেছিস। দুটোর বেশি সন্তান হলে অনেক প্রব্লেম। এর দ্বারা আমার প্রেস্টিজের হানি হবে।

: কী প্রব্লেম? কেন আপনি এ অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতে চাচ্ছেন?

: প্রব্লেম অনেক, তার ফিরিস্তি দেওয়ার সময় নেই। তাইতো দেখছিস না আধুনিক কালের প্রায় পরিবার-ই এ পন্থা অবলম্বন করছে। অধিকসংখ্যক সন্তান জন্মালে সীমিত আয়ের মাধ্যমে ভাল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ, সামাজিক পরিবেশ তথা উন্নত জীবনযাপন সুঙ্গুভাবে প্রদান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে গোটা পরিবারের অর্থনৈতিক কাঠামোই বিপন্ন হতে বাধ্য। এমতাবস্থায় অযথা সন্তানের সংখ্যা বাড়ানোর চেয়ে উপার্জনের সাথে সঙ্গতি রেখে জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সন্তানের সংখ্যা স্বল্প রাখাই উচিত। সুতরাং ছেলে হোক আর মেয়ে হোক দু'টি সন্তানই যথেষ্ট।

: ভাইজান! আপনি ভুল বলছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–'আল্লাহু খাইরুর রাজিকীন।' অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন উত্তম রিজিকদাতা। ভাইজান একটা কথা কি, আধুনিক কালে এটা অনস্বীকার্য যে, পাশ্চাত্য কৃষ্টি-কালচারের বিষাক্ত আবহাওয়ায় গোটা ইসলামী জগৎ প্রায় ধ্বংসের সম্মুখীন। পশ্চিমা কৃষ্টি-কালচারের অন্ধপ্রীতি মুসলমানদেরকে পার্থিব চিন্তা-চেতনা ও পারলৌকিক ধারণা থেকেও নিস্কৃয় করে রেখেছে। তার একটি স্বরূপ হচ্ছে 'জন্মনিয়ন্ত্রণ'। নিশ্চয়ই এটা একটা অনৈসলামিক ও অবৈধ কাজ। কেননা এটা জীব হত্যা তথা বংশনিধনের নামান্তর। পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় এর নিষেধ রয়েছে যে, 'দুর্ভিক্ষের আশংকায় তোমরা স্বীয় সন্তানদেরকে হত্যা করো না।' প্রিয় নবীজীর হাদীস শরীফে এ কাজকে 'গোপন হত্যা' রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে এ কাজ হচ্ছে হারাম। কেননা এটা ছিল মুশরিকদের কর্মকাণ্ড ।

মহান রাব্বুল আলামীন নভঃমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা। মানব ব্যতীত অন্য কোনো প্রাণীর অন্ন-বস্ত্রের জন্য নেই কোনো কল-কারখানা, নেই কোনো চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য। তথাপি তারা খেয়েদেয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করছে। তাদের মাঝে নেই কোনো আন্দোলন-ফান্দোলন। কিন্তু যে মানব সৃষ্টির সেরা, তারাই আজ বংশনিধনের পথ বেছে নিয়েছে। অথচ আল্লাহ তাআলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন, 'সৃষ্টি করেছেন যিনি, রিজিকদানের দায়িত্বও তারই।' তিনি আরো বলেন–'পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিজিকদানের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেননি।' আল্লাহ তাআলা যখন আসন্ন সন্তানের রিজিকদানের ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গীকার করেছেন, তাহলে কোন কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় পরিবার পরিকল্পনার নামে অভিশপ্ত পন্থা অবলম্বন করতে চাচ্ছেন? আপনার তো টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ কোনো কিছুরই অভাব নেই। দারিদ্র্য অবস্থায়ও যখন এ পন্থা অবলম্বন করা হারাম, তাহলে আপনার মতো ব্যক্তিদের জন্য কীভাবে হালাল হতে পারে? ভবিষ্যতের কথা ভেবে আপনার এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে ফেলুন।

সাজিদ চৌধুরী আরো কিছু বলতে যাবে, তখন তাকে থামিয়ে দিয়ে আশিক চৌধুরী বললো–ছোট পরিবার যে সুখী পরিবার এই কথাটা কি তুই অস্বীকার করতে পারবি?

সাজিদ চৌধুরী : না না, এ কথা আপনি গলদ বলছেন। কখনো এমনও দেখা গেছে যে, আট-দশজনের পরিবার নিয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দে দিনাতিপাত করছে, আর দু'জনের ছোট পরিবার নিয়ে দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। আর ভাইজান! 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার' এ শ্লোগানে বিমুগ্ধ হয়ে কোনো ব্যক্তি যদি পরিবার বড় হওয়ার আশংকায় বিয়ে না করে অথবা জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো পন্থা অবলম্বন করে, তাহলে ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে সে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অভিশপ্ত ও ঘৃণিত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–'সন্তান-সন্ততির আশংকায় যে ব্যক্তি বিয়ে বর্জন করে সে আমার উম্মত নয়।' এখন এটা পরিষ্কার বোধগম্য হলো যে, ইসলামী শরীয়তে কোনো পর্যায়েই এটাকে সমর্থন করে না। নিছক ভোগ লিপ্সা পরিতৃপ্তির জন্য এমনটি করা মারাত্মক গুনাহের কাজ। বরং এ আন্দোলনের

ফলে যেসব মানসিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়, তা কোনো সুস্থ বিবেকবান ব্যক্তি কখনো জাতির জন্য কল্যাণপ্রদ বলে গ্রহণ করতে পারে না।

আশিক চৌধুরী : ইম্পোসিবল! তুই তো জানিস সব কাজই পরিকল্পনা ভিত্তিক ও নিয়ন্ত্রণের গণ্ডির ভেতর রেখে সম্পাদন করা উচিত। এই হিসেবে তো জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনাও যুক্তিসঙ্গত?

সাজিদ চৌধুরী : যুক্তিতে ইসলাম নয়, ইসলাম যুক্তির উর্ধ্বে। পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ বস্তু দু'টি সর্বস্থানে কাঙ্খিত ও লোভনীয় হলেও পরিবারের সাথে পরিকল্পনা এবং জন্মের সাথে নিয়ন্ত্রণ বস্তুটি বেমানান। এমনটি শুনলে মানুষ আঁতকে উঠতে হয়। যেমন, বসন্ত শব্দটি যখন কোনো কাল বা ঋতুর সাথে সম্পৃক্ত হয়, তখন একটি আনন্দদায়ক সময়ের অর্থ বুঝায়। কিন্তু সে বসন্ত শব্দটি যদি রোগের সাথে সংযুক্ত করা হয় তখন যে অর্থ বুঝায়, এর ছোঁয়াচে ও সংক্রামক ব্যাধি থেকে দূরে থাকাটাই হয় তখন প্রতিটি মানুষের আরজু ও কামনা। পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ বস্তু দু'টিও তেমনি।

তাছাড়া এ নিয়ে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা বীজ হিসেবে ফল পাওয়ার আশা করা যায়। পিতা-মাতা যদি বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হন, তাদের সন্তানরাও বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হবে। ফলে তাদের সন্তানরা রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের জন্য সম্পদস্বরূপ হবে। যারা জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে তারা কি এটা প্রমাণ করছে না যে, তারা মুর্খ ও বোকা, তাই সন্তান জন্ম দিচ্ছে না। কারণ তারা সমাজের জন্য বোঝা হবে।

ধরা যাক কোনো লোকের এক ছেলে ডাক্তার ও এক ছেলে ইঞ্জিনিয়ার এবং তার প্রতিবেশীর চার ছেলে ডাক্তার ও চার ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। তাহলে সমাজে কে বেশি প্রভাবশালী ও সম্মানিত হবেন? অবশ্যই আট সন্তানের জনক প্রভাবশালী ও সম্মানিত হবেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ধনী লোকের শত্রু বেশি। তাই ধনী লোকদের উচিত বেশি সন্তান নেওয়া। সন্তান হলো মানুষের সমাজে বেঁচে থাকার জন্য ঢালস্বরূপ। ধনীরা জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করে মূলত তাদের নিরাপত্তা বলয়কে ধ্বংস করছে।

আর সন্তান হলো নারীর জন্য ঢালস্বরূপ। সন্তানরা যতটা না পিতার, তার চাইতেও বেশি মাতার। আর তাই অধিক সন্তানের মাতা তার স্বামী

কর্তৃক সামান্য কারণে বা বিনা কারণে নিগ্রহের সম্ভাবনা প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। অধিক সন্তানই নারীকে পরিবারে ও সমাজে প্রভাবশালী করে তোলে। তাছাড়া দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্য জনসংখ্যা ঢালস্বরূপ। চীনের একজন নেতা বলেন, 'কোনো পারমাণবিক যুদ্ধে যদি চীনের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ মারা যায়, তাতেও আমাদের কোনো ভয় নেই।' অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন, দেড়শ' কোটি জনগণ তাদের দেশের নিরাপত্তার জন্য ঢালস্বরূপ। ফিলিস্তিনের মুসলমানরা যদি জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করতো ইয়াহুদী ইসরাইলীরা যেভাবে নগ্ন হামলা চালাচ্ছে, তবে কি তারা নিশ্চিন্ন হয়ে যেত না?

তাছাড়া দেখা যায় যে, প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারেই একটি বা দু'টি সন্তান অতি মেধাবী। আমরা কি জানি আমাদের কত নাম্বার সন্তান অধিক মেধা নিয়ে দুনিয়াতে আসবে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতা-মাতার ১৩ নাম্বার সন্তান। কী হতো যদি তার পিতা-মাতা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতেন?

সাজিদ চৌধুরীর মগজখোঁচা কথায় কথায় আশিক চৌধুরীর অফিসের টাইম ঘনিয়ে এলো। এ ব্যাপারে ভেবে দেখার আশ্বাস দিয়ে আশিক চৌধুরী সেখান থেকে উঠে পড়ে।

ডাইনিং রুম থেকে ফাওজিয়া জামান ও নুসরাত সাদিয়া সাজিদ চৌধুরীর সব কথাই শুনলো। তার কথায় আশিক চৌধুরী একটু বদলালেও ফাওজিয়া জামানের গায়ে লাগেনি ওসব কথা। সে তার সিদ্ধান্ত থেকে অনড়। নুসরাত সাদিয়া সে ব্যাপারে তাকে অনেক দিন বুঝিয়েছে। সাজিদ চৌধুরীও তার ভাইকে আরো কয়েকদিন বুঝিয়েছে। কোনো কাজ হয়নি।

সাত.

আশিক চৌধুরীর দ্বিতীয় সন্তান হলো। চাঁদের মতো ফুটফুটে পুত্র। এরপরই তারা জন্মনিয়ন্ত্রণের পন্থা অবলম্বন করে নিজেদেরকে চিরদিনের জন্য সন্তান উৎপাদনোক্ষম করে ফেলে। ফারিহা ও হাসানকে নিয়ে তাদের দিন স্বাচ্ছন্দেই কাটতে থাকে। আশিক চৌধুরীর দ্বিতীয় সন্তান হাসান। মেয়ে ফারিহা এখন কিন্ডারগার্টেনে যায়। হাসান ছোট, তাই তার মায়ের কাছে বাসাতেই

পড়ে। ফাওজিয়া জামান সন্তানদের খুব যত্ন নেয়। কাজের বুয়াই রান্নাবান্নার কাজ সেরে ফেলে। ফারিহাকে আনা নেওয়ার দায়িত্বও তার।

কিছুদিন হলো হাসানকেও ফারিহার সাথে ভর্তি করে দিয়েছে। এখন তারা একসাথেই আসা যাওয়া করে। তবুও নিরাপত্তার জন্য কাজের বুয়াকে সাথে যেতে হয়। ফাওজিয়া জামানও মায়ের স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে গড়ে তুলতে লাগলো তাদেরকে। এভাবে কেটে গেল আরো কয়েক বছর।

আট.

আজ ছয় দিন ধরে হাসানের খুব জ্বর। তার চিকিৎসার জন্য বাসায় প্রাইভেট ডাক্তার রেখেছে। কিন্তু জ্বরের কোনো ভাল দিক দেখা যাচ্ছে না। জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধিই পাচ্ছে। হাসানের জন্য সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে তার বাবা ও মা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে তারা। ভেবে ভেবে তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত হাসান টাইফয়েট জ্বরে মারা গেল। পরিবারের সবার উপর নেমে এলো শোকের তিমির ছায়া। সুখ পাখিটি পালিয়ে গেছে তাদের থেকে। পুত্র বিয়োগের শোকে মা ফাওজিয়া জামানের আহার নিদ্রা বন্ধ হয়ে গেছে। বাবা আশিক চৌধুরীরও ক'দিন ধরে অফিসে যাওয়া হচ্ছে না। ফারিহা অনেকদিন ধরে বাবা-মা'র ভালবাসা থেকে বঞ্চিত।

হাসান মারা যাওয়ার পর থেকে বাসায় কেমন যেন একটা নিস্তব্ধতা বয়ে যাচ্ছে। ফাওজিয়া জামান তাকে ভুলে থাকতে চায়, কিন্তু তা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তার কথা বার বার মনে পড়ে। মাঝে মাঝে ফারিহাকে দেখে মনকে সান্ত্বনা দেয়। তাকে দেখে আঁখিযুগল একটু শীতল হয়। এখন দু'জনের সোহাগ দিয়ে তাকে গড়ে তুলতে লাগলো। এ গতিতেই কাটতে থাকে তাদের বছরগুলো।

নয়.

ফারিহা ক্লাস এইটের ছাত্রী। সে শহরের বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ে। তার বাবা-মা তাকে খুব ভালবাসে। ফাওজিয়া জামান এখন সব শিশুর প্রতিই স্নেহময়ী হয়ে উঠেছে। ফারিহা স্কুল থেকে আসতেই সে তাকে বুকে জড়িয়ে

ধরে চুমো খায়। আদর করে। তার স্কুল ছুটি হয় বিকেল চারটায়। সোয়া চারটার মধ্যেই সে বাসায় ফিরে আসে। কোনো দিন এর ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু আজ পাঁচটার কাঁটা পেরিয়ে যাচ্ছে, এখনও সে ফিরেনি। ফাওজিয়া জামান পেরেশান, উদগ্রীব তার মন। ফারিহা বাসায় না ফেরার কথা শাশুড়ী মাকে জানালো। সন্ধ্যে সাতটা বেজে গেছে এখনও ফিরেনি। সে খবর আশপাশের বাসাগুলোতেও জানাজানি হয়ে গেল।

বাবা আশিক চৌধুরী শুনে তার মাথায় আচমকা বিদ্যুৎ খেলে গেল। মেয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে সে। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না তাকে। রাত গড়িয়ে দিন এলো। আশিক চৌধুরী এ্যনাউন্স করার ব্যবস্থা করে। জাতীয় দৈনিকগুলোতে বিজ্ঞপ্তি দেয়। রেডিও টেলিভিশনে ঘোষণা দেওয়ার ব্যবস্থাসহ আরো বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালায়। কোনো খোঁজ নেই। অনেকদিন হয়ে গেল তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ফাওজিয়া জামান পাগলপারা। ঠিক মতো খেতে পারেন না। দিন নেই রাত নেই সারাক্ষণ শুধু ফারিহা ফারিহা জল্পনা। নুসরাত সাদিয়া তাকে সান্ত্বনা দেয়, কোনো সান্ত্বনাই সে মানে না। এখনও হাসানকে ভুলতে পারেনি, তাকে হারানোর ঘা এখনও শুকায়নি, তার উপর মেয়ে নিখোঁজ, এ যেন কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা। শোকে দুঃখে চলছে তাদের জীবন। সাজিদ চৌধুরীর সুখের পরিবার দেখে তাদের শোকের জ্বালা আরো বেড়ে যায়। তা দেখে নিজেদেরকে ধিক্কার দিতে হয়। এভাবে অনেক বছর কেটে গেল। তাদের আর কোনো সন্তান হয়নি। সবই রাব্বুল আলামীনের মর্জি।

তারা আজ লাঞ্ছনার আত্মগ্লানীতে গুমরে মরছে। ভ্রুণ হত্যার অভিশাপে বিদগ্ধ হচ্ছে দুনিয়াতেই। পুত্র বিয়োগের পর ফারিহার কিডন্যাপের ঘটনা মনে হলে তাদের বুক কেঁপে উঠে। গণ্ড বেয়ে উত্তপ্ত অশ্রু ঝরে। ক্রন্দনে বক্ষদেশ থেকে বেরিয়ে আসে হৃদয়বিদারক শব্দ। কাটতে থাকে তাদের অনুশোচনার জীবন। অনুতাপের হিমালয়ে চড়তে চড়তে ফারিহার ফিরে আসার স্বপ্ন দেখে। আর অধির অপেক্ষায় চাপাসুরে বলতে থাকে–ফারিহা তুমি আর দূরে থেকো না, তুমি ফিরে এসো। ❐

ইরাকী শিশুর আর্তনাদ

২০০৩ সাল। বাগদাদ নগরী। চারদিকে বোম্বিং এর ঠুস ঠাস শব্দ। রাতের খাবারের পর বইয়ের পাতায় মন বসছে না কচি কিশোর আলী ইসমাঈলের। সাহিত্য বইটা বন্ধ করে ক্লান্ত গাটা বিছানায় এলিয়ে দিল আলী। কিন্তু ঘুম আসছে না তার। বিছানায় পড়ে এপাশওপাশ করতে থাকে সে।

এতক্ষণে আলীর বাবা-মা ও ছোট ভাইয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। আর স্বপ্নের রাজ্যে বিরাজ করতে থাকে আলী। দূর-দূরান্তের বোম্বিং এর শব্দগুলো তার স্বপ্নকে আড়াল করে দিচ্ছে। সে বড় হবে, বড় হয়ে সেনাকর্মকর্তা হবে। অবিচল ও অকৃত্রিম ভালবাসা রেখে দেশের জন্য, ধর্মের জন্য লড়াই করবে.....।

হঠাৎ অতি নিকটে বোমার একটি শব্দ শুনে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো আলী। এরই মধ্যে পরপর কয়েকটি বোমা ফাটলো তার মাথার উপর। বুশ-ব্লেয়ারের পাণ্ডরা নিমিষেই বোমা মেরে উড়িয়ে দিল তাদের বাড়িটি। মুহূর্তেই শাহাদাত বরণ করলেন আলীর প্রিয় বাবা-মা ও ছোট ভাইয়া। আর আলী আটকা পড়ে গেল ধ্বংসস্তুপের নিচে। প্রতিবেশীরা তাকে অনেক কষ্টে উদ্ধার করলো সেখান থেকে। বোমার আঘাতে ঝলসে গেছে তার কচি শরীর। আলীর দুটো হাতই কেড়ে নিয়েছে শয়তানের দোসর ফিরাউন-নমরুদের চেলা-চামুণ্ডরা। এখন পিতৃ-মাতৃহীন অসহায় আলী শুধু ইয়াতিমই নয়, শারীরিকভাবেও সে পঙ্গুত্বের যন্ত্রণায় কাতর।

শুধু আলী নয়। তার মতো হাজার হাজার শিশু-কিশোর আজ পিতৃ-মাতৃহীন ইয়াতিম। পঙ্গুত্বের যন্ত্রণায় কাতর। তাদের দেশের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের কাছে রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র আছে–এই মিথ্যা অজুহাতে অন্যায়ভাবে ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি নির্বিচারে হত্যা করে চলছে ছোট ছোট শিশু। হাজার হাজার অসহায় বেসামরিক নারী-পুরুষ। বাগদাদের রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে অসংখ্য শিশু-কিশোরের লাশ। হাসপাতালের মর্গে রক্ষিত নিহতদের প্রায় একতৃতীয়াংশই শিশু। হাসপাতালের বেডে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে হাজারো নিরপরাধ ইরাকী শিশু। মার্কিন ক্ষেপনাস্ত্রের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত শিশুদের আর্তনাদে ভারি হয়ে উঠেছে বাগদাদের আকাশ-বাতাস। এতে একটুও কেঁপে উঠেনি মানবতাবাদের ধ্বজাধারী বুশ-ব্লেয়ারের পাষণ্ড হৃদয়। আলীর মতো আরো অনেক শিশুর হাত-পা নেই। কোনো শিশুর চোখ উপড়ে গেছে। কোনো শিশুর ধড় থেকে শরীর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কোনো শিশুর মাথার মগজ ছিটকে পড়ে আছে বাগদাদের রাস্তায়। এ এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। সভ্য বলে দাবিদার কোনো মানুষের পক্ষে এমন আচরণ কল্পনাও করা যায় না।

আলীর কান্নার স্রোত ইরাকের দজলা-ফুরাত পেরিয়ে এখন পৌঁছেছে কুয়েতের একটি হাসপাতালের বেডে। হৃদয়ের কান পাতলেই শোনা যায় তার আর্তনাদ। আলী এখন ডানাবিহীন পাখির বাচ্চার মতো। বেদনায় ছটফট করছে তার সারা শরীর। অশ্রুসজল চোখে বেরিয়ে আসে তার প্রাণের আকুতি–আমরা এমন কী অপরাধ করেছি বুশ-ব্লেয়ারের কাছে? আমাদের উপর কেন এ অমানবিক জুলুম-নির্যাতন? কোথায় আমাদের অধিকার? কোথায় জাতিসংঘ সনদ? সেখানে আমাদের দশটি মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ১৯৪৮ সালে সবদেশে মহাদেশে আমাদের সুন্দর জীবন গড়ার কথা ভেবে জাতিসংঘ সনদ তৈরি করা হয়। সেখানে রয়েছে–সশস্ত্র সংঘাতকালীন বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের বাধ্যবাধকতা অনুসারে শরীক রাষ্ট্রসমূহ

যুদ্ধকবলিত শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ফলপ্রসূ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শিশুর প্রয়োজন স্নেহ-মমতা ও ভালবাসা। শিশুর পূর্ণ অধিকার রয়েছে বড়দের কাছ থেকে স্নেহ ও সমবেদনা পাওয়ার।

আরো রয়েছে–শিশুর মাকে ও শিশুকে পরিচর্যার নিশ্চয়তা দিতে হবে। শিশুকে শান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ নিয়ে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে। শিশুর সামনে এমন কোনো আচরণ করা যাবে না, যা তাদের কোমল মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। শিশুর মনে ভ্রাতৃত্ববোধ ফুটিয়ে তুলতে হবে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি শিশুকে তার মৌলিক অধিকার দিতে হবে।

কিন্তু কোথায় আমাদের মৌলিক অধিকার? সেই অধিকারের কথাকে লংঘন করে বুশ-ব্লেয়ারের মতো শয়তানেরা আমাদের দেশের তেল সম্পদ দখলের লোভে আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ইয়াতিম করছে আমার মতো হাজার হাজার ভাই-বোন। জীবনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করে নিচ্ছে আরো অনেকে। হে পাষণ্ড বুশ-ব্লেয়ার! আজ যদি তোমাদের ছেলে-মেয়েরা ইয়াতিম হতো বা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যেত, তাহলে তোমাদের কাছে কেমন লাগতো?

টিভির পর্দায় আমাদের এ করুণ অবস্থা দেখে তোমাদের অন্তরাত্মা কি একটুও কাঁপে না? তোমরা কি এত নির্দয়, এত পাষাণ? তোমরা পারবে কি আমার বাবা-মা এবং ছোট্ট আদরের ভাইয়াকে ফিরিয়ে দিতে? আমার হারিয়ে যাওয়া হাত দু'টি ফিরিয়ে দিতে? গ্রহণ করবে কি আমার পঙ্গুত্ব জীবনের ভার?... এমন সময় কর্তব্যরত ডাক্তার এসে আলীকে থামিয়ে দিলেন। ❐

রক্তপিপাসু ছেলেধরা

এক.

চট্টগ্রাম শহর। রকিবের বাবা আলী আশরাফ খান অসুস্থ। এক সপ্তাহ যাবৎ তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রকিবদের বাসা থেকে হাসপাতাল হেঁটে গেলে বিশ মিনিটের পথ। রকিবকেই তার বাবার জন্য হাসপাতালে খাবার নিয়ে যেতে হয়। সে দশম শ্রেণীতে পড়ে। তার ছোট বোন শামীমা অষ্টমের ছাত্রী। দুই ভাই-বোন মা-বাবার খুবই বাধ্যগত সন্তান। তাদের স্কুল ছুটি হলো বিকেল চারটায়। সামান্য খাওয়া-দাওয়া সেরে রকিব তার বাবার জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছে। যাওয়ার আগে তার মা'র কাছ থেকে দুই টাকা চেয়ে নিল। পথে আছে খেয়াঘাট। খেয়া পারাপারে দুই টাকা লাগে। খেয়া পার হয়ে একটু সামনে যেতেই চাদর পরিহিত দু'জন লোক এসে রকিবকে বললো–তোমার নাম কী? কোথায় যাচ্ছো তুমি?

রকিব : আমার নাম রকিবুল হাসান খান। থানবী মডার্ন হাসপাতালে যাচ্ছি। আমার বাবা অসুস্থ, তাঁর জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছি।

তাদের একজন বললো–তোমার ফাদারের নাম কী?

রকিব : এ.কে.এম আলী আশরাফ খান।

: বাহ্! চমৎকার। তোমার ফাদার বর্তমানে থানবী হাসপাতালে নেই। সেখান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

: বাবা এখন কোথায় আছেন, তা যে আমি চিনি না!

: আরে তুমি চেনো না বলেই তো আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা হাসপাতালেরই লোক, চলো আমাদের সাথে।

দুই.

রকিবকে তারা মাইক্রোতে করে নিয়ে চললো। শোঁ শোঁ শব্দে চলছে মাইক্রো। রকিব নির্বাক। কোন কথা বলতে পারছে না সে। তারা রকিবের মাথার দুই পাশে পিস্তল ঠেকিয়ে রাখলো। আর 'শব্দ করলে জান বের করে ফেলবো' বলে ভয় দেখালো। রকিব প্রাণের ভয়ে কোনো কথা বলতে পারলো না। তারপর কি হলো সে আর কিছুই জানে না। তাকে তারা অজ্ঞান করে ফেলেছে।

রকিবকে তারা একটি দালানের পঞ্চম তলায় নিয়ে তুললো। সেটি পাঁচতলাই এবং খুব লম্বা। জায়গাটি খুব নীরব ও গোপন। তার চারপাশে শুধু দালান আর দালান। এরই মাঝে তা নীরব দাঁড়িয়ে আছে। দালানটির কোনো সৌন্দর্য নেই। নিচের তলাগুলো কেমন এবং সেগুলোতে কী আছে কে জানে। পঞ্চম তলায় রুমের কোনো বিন্যাস নেই। পুরোটাই একটি হল রুমের মতো। তার একপাশে একটি মাত্র দরজা। জানালা নেই একটিও। পুরো রুমে একটি মাত্র বাল্ব, তাও আবার ফোরটি পাওয়ারের। আর বাইরের আলোতো পড়েই না। দিন নেই রাত নেই সারাক্ষণ রুমটি ঘুমোট অন্ধকারে ছেয়ে থাকে। আর বিদ্যুৎ গেলেতো হলোই। রুমটির অবস্থা দেখলে মনে হবে কয়েক বছর যাবৎ পরিষ্কার করা হয় না। ফ্লোরে অসম্ভব আবর্জনা। দেয়ালে পোকা-মাকড় বাসা বেঁধে রেখেছে। এ যেন পোকা-মাকড়ের রাজত্ব। তার সাথে দুগর্ন্ধতো আছেই। টয়লেট দুটোতে পা রাখার ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা নেই। সব মিলিয়ে এক ভয়ংকর পরিবেশ। বসবাসের একদম অনুপযোগী।

এই পাঁচতলা ডাস্টবিনে রকিবের মতো আরো ত্রিশ-পয়ত্রিশজন ছেলে মেয়েকে আটক করে রাখা হয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে তাদের চোখ শুকিয়ে গেছে। দেখলে মনে হবে দু'মাস ধরে গা গোসল ধোয়া নেই। গায়ের কাপড়-চোপড় ময়লায় ভর্তি। মাথার চুলগুলো এলোমেলো। পাগলের চেয়েও অধম। পাগল তো ইচ্ছে করলে কিছু করতে পারে, তারা সেটাও

পারে না। সকালে বিকালে দুটো করে শুকনো রুটি তাদের নিত্যদিনের খাদ্য। সাথে আছে অপরিমিত ট্যাপের পানি। কথায় আছে 'হাতে মারবো না, ভাতে মারবো'। এই প্রবাদটি পুরোপুরি প্রয়োগ হচ্ছে রকিবদের ক্ষেত্রে।

তিন.

রকিবকে তারা ধরে এনেছে প্রায় দু'মাস। এই দু'মাসে সে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আর তিনদিন পর আনন্দ উল্লাসে ভরা পবিত্র ঈদুল আজহা। রকিব জানে না সমাগত কুরবানীর ঈদের আনন্দ তার নসীবে আছে কিনা। এতদিনে আরো অনেকে তাদের সাথে আটক হয়েছে, আর অনেককে তারা হারিয়েছে। ওরা রুম থেকে একজন করে নিয়ে যায়, কিন্তু আর ফিরিয়ে আনে না। কখনো তাদের রক্তমাখা জামাটা এনে সবার চোখের সামনে ঝুলিয়ে রাখে। তা দেখে রকিবদের ক্ষুদ্রপ্রাণগুলো মোচড় দিয়ে উঠে। রকিব জানে–হয়তো এদেশেই তাদের কিডনী, চক্ষু ইত্যাদি কোটি কোটি টাকায় বিক্রি করা হয়, নতুবা বিদেশে পাচার করা হয়। সে কয়েক দিন তার সাথীদের নিয়ে পালাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ রীতিমতো কয়েকজন তাদের প্রহরায় থাকে। সে একা হলে অনেক আগেই পালাতে পারতো, কিন্তু রকিব এমনটি করেনি। সে চায় সবাইকে এই রক্তপিপাসুদের হাত থেকে উদ্ধার করতে।

চার.

বাড়িতে রকিবের মা-বাবা, ভাই-বোন সবাই পাগলপারা। তাকে তারা অনেক খোঁজাখুঁজি করেছেন। তার চিন্তায় না খেয়ে না দেয়ে তার মা-বাবা মৃতপ্রায় হয়ে গেছেন। ঘুম পাখিটি তাদের চোখ থেকে উড়ে গেছে। তারা অনেক ফকির-কবিরাজ ধরেছেন, কোনো কাজ হয়নি। পরিশেষে একজন আল্লাহ্ওয়ালা দরবেশ কালাম সম্বলিত একটি তাবিজ দিয়ে বললেন–'আপনাদের মানিক এনে দেওয়ার কুদরত আমার নেই। আল্লাহ পাকের কালামের মাধ্যমে শুধু অবস্থাটা জানিয়ে দিতে চেষ্টা করবো। এক গ্লাস দুধে এই তাবিজখানা ছেড়ে দেবেন। এটা যদি দুধের উপর ভেসে

থাকে, তাহলে বুঝবেন আপনাদের ছেলে নিরাপদে আছে। যদি ডুবে যায় তাহলে বুঝতে হবে সে নেই। আর যদি পাত্রের দুধ টগবগ করতে থাকে এবং তাবিজখানা ঘুরতে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে আপনাদের ছেলে ঘোর মুসীবতে আপতিত। আর শুনুন! আল্লাহ্ পাক যদি তাকে ফিরিয়ে আনেন, তাহলে সে ঘরে প্রবেশ করার আগেই দুধসহ তাবিজখানা নির্জনে ফেলে দিতে হবে।'

রকিবের মা-বাবা বাড়িতে এসে পরহেজগার দরবেশের কথার তামিল করলেন। তাবিজটি গ্লাসে ছেড়ে দিতেই ঘুরপাক খেতে লাগলো এবং দুধ উৎরাতে লাগলো, তারা রকিবের অবস্থা বুঝতে পেরে আরো পেরেশান এবং চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

পাঁচ.

আজ পবিত্র ঈদুল আজহা। ভোর থেকে বাইরের ছেলে-মেয়েরা আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছে। ঈদের কারণে প্রহরায় একজন ব্যতীত আর কেউ নেই। সুযোগ পেয়ে রকিব দরজার পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালো। সে একমনে ছেলে-মেয়েদের আনন্দ-উল্লাস দেখছে। ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে মুবারক ঈদের গজল গাইছে। হঠাৎ রকিবের গায়ে একটু হাওয়া লাগলো। অনেকদিন পর বাইরের হাওয়া লাগাতে তার মনটা উতলা কেমন যেন হয়ে উঠলো। তৎক্ষণাৎ গণ্ডদ্বয় বেয়ে দু'ফোটা আঁখিনিংড়ানো তপ্ত অশ্রু ঝরে পড়লো। সে তার বন্দী সাথীদের কাছে ছুটে এলো। তাদের লক্ষ্য করে বললো–বন্দী ভাই-বোনেরা শোন! যার যখন জীবন তরী শেষ হয়ে যাবে, তাকে তখন মরতেই হবে। চাই সে যেভাবেই মরুক। তাই চলো আজ আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। হায়াত না থাকলে এখানে থাকলেও মরতে হবে আর পালানোর কালে ধরা পড়ে গেলেও মরতে হবে। সুতরাং পালানোই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক।'

রকিবের কথার উপর কেউ কেউ একমত হলো। আর অনেকে প্রাণের ভয়ে রাজি হলো না। রকিব তাদেরকে নিয়ে চুপিসারে ছাদে উঠে এলো। দু'জনকে সিঁড়ির গোড়ায় প্রহরায় রাখলো। সাথীরা রকিবকে জিজ্ঞেস

করলো–'পালাতে হলে তো প্রথমে নিচে নামতে হবে। এখন আমরা নামবো কী করে?' রকিব বললো–'আমি অনেক আগে ভেবে রেখেছি, এই টয়লেটের পাইপ বেয়েই নামতে হবে। যারা পারবে না তাদেরকে আমি নামাতে চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।'

রকিবের কথা শুনে একটি মেয়ে বললো–'রকিব ভাই! এই পাইপ বেয়ে নামাতো আপনাদের জন্যই দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমরা মেয়েরা নামবো কী করে?' 'দুঃসাধ্যকে সাধ্য করে নামতে হবে, বাকি আল্লাহ আছেন আমাদের সাথে।' রকিব কাঁদো কাঁদো সুরে বললো এ কথাটি। এ কথা বলেই সে দশ-বারো বছরের একটি ছেলেকে তার কোমরের সাথে বেঁধে পাইপ বেয়ে নামতে শুরু করলো। সাহস করে একে একে সবাই নেমে পালাতে লাগলো। রকিব ছোট ছেলে-মেয়েদের নামালো। সে কখনো এরকম সাহস করেনি। আজ আল্লাহ তাআলা তাকে এরকম দুরন্ত সাহস দান করেছেন। পরপর সবাই যে যেদিকে পারলো পালিয়ে গেল।

ছয়.

পরিশেষে রকিব দিশেহারা হয়ে দৌড়াতে শুরু করলো। সাথে শুরু হয়েছে ঝড়-তুফান। দৌড়াতে দৌড়াতে সে বিশ্রামের জন্য একটি বাসার কাছে এসে থামলো। বাসার ভেতরের ভদ্রলোক তার ছেলেকে লক্ষ্য করে বললো–'কিরে রকিব তুই এখানে কেন?' এই আওয়াজ তার কানে আসতেই তার বুকের বাকি পানিটুকু শুকিয়ে গেল। সে মার মার করে আবার দৌড়াতে লাগলো। দৌড়িয়ে আবার সেই ভয়ংকর পাঁচতলা দালানের কাছেই এসে পড়লো। এই যম দালান দেখামাত্র তার পায়ের নিচের মাটি যেন সরে গেল। আসমানটা মাথায় ভেঙে পড়ল। এখানে এসে সে আর দাঁড়ালো না, বিরামহীনভাবে দৌড়াতে লাগলো।

এ দিকে কালো রাত নেমে এলো। তার উপর তুমুল ঝড়-তুফান। সে অন্ধ হয়ে দৌড়াচ্ছে। এবার সে ঐ বাসার সামনে আর থামেনি। একটানা দৌড়িয়ে বাস স্টেশনে এসে পৌঁছলো। ঝট করে একটি বাসে উঠে পড়লো। কন্ট্রাকটর রকিবের কাছে ভাড়া চাইলে তার বিপদের কথা

জানালো। কন্ট্রাকটরের মনে দয়ার সঞ্চার হলো। সে আর ভাড়া চায়নি। গাড়ি চড়তে চড়তে একসময় হেলপার তাদের স্টেশনের নাম বললে, সে নেমে পড়লো। তাদের স্টেশনে নেমে একটি দীর্ঘ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

স্টেশনে তেমন লোকজন নেই। রাত প্রায় দুইটা। ক্ষুধায় তার পেট চোঁ চোঁ করছে। সর্বশেষ দোকানটি বন্ধ করে ফেলছে। সে একপিচ গোল বন কিনলো। গোলবন খেয়ে টিউবওয়েল থেকে পেট পুরে পানি পান করে হাঁটতে লাগলো। সে হাঁটছে আর ভাবছে–খেয়া আছে কিনা। এত রাত পর্যন্ত না থাকারই কথা। আজ যেন তার জন্য খেয়ার মাঝি বসে আছে। মাঝি রকিবকে পার করে ভাড়া চাইলে রকিব বিনয়ের সুরে বললো, দাদা! দু'মাস আগে বাসা থেকে দুই টাকা নিয়ে বেরিয়ে এক টাকা আপনাকে দিয়েছিলাম। আজ দু'মাস পর বাকি এক টাকা দিয়ে একটা গোলবন .....। মাঝি রকিবের দুঃখ বুঝতে ভুল করলো না। রকিব ছেলেধরার হাত থেকে মা-বাবার কোলে গিয়ে উঠলো। আনন্দে ভরে উঠলো মা-বাবার মন। বেদনামলিন চেহারায় ফুটে উঠলো উজ্জ্বল হাসি। ❐

দুর্গম পথের যাত্রী

এক.

রাজধানীর একটি নামকরা মাদরাসায় পড়াশোনা করে ফয়সাল। আর দু'বছর পর দাওরায়ে হাদীস শেষ হবে তার। পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী ও মনোযোগী। গত বছর বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় সর্বোচ্চ মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাও করে সে। সময় সুযোগে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে তার। জাতীয় দৈনিকগুলোতে সমাজ উন্নয়নমূলক ফিচারও প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি। মোটামুটি একজন লেখক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে সে। শহরে তো বটেই তার গ্রামেও এ পরিচিতিটা কম নয়। ইতোমধ্যে তার বেশ কয়েকটি লেখা এলাকাবাসীর নজর কেড়েছে।

দুই.

প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ছুটি কাটিয়ে আসার পর কেমন যেন চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে ফয়সাল। প্রায়ই একটা বিষন্নতার ছাপ পরিলক্ষিত হয় তার চেহারায়। তার বন্ধু মাসউদও লক্ষ্য করলো বিষয়টা। মাসউদ তার লেখিয়ে বন্ধুদের একজন। ফয়সালের কাছাকাছি অন্য একটি মাদরাসায় পড়াশোনা করে।

পরশ পাথর সাহিত্য সাংস্কৃতিক ফোরামের উদ্যোগে পুরানা পল্টনে নিয়মিত একটি সাহিত্য সমাগম অনুষ্ঠিত হয় তাদের। এই সমাগম কখনো মিস করে না ফয়সাল। শত বাধা-বিপত্তি মাড়িয়ে হাজির হয় সেখানে। কিন্তু গত সমাগমে আসেনি সে। ফয়সালের এ বিষয়টাও ভাবিয়ে তুললো মাসউদকে। ইদানীং পড়াশোনায়ও একটু অমনোযোগী হয়ে পড়ে সে। লক্ষ্য করলো ক্লাসমেট ও রুমমেটরা। অনেক পীড়াপীড়ি করেও এর কারণ বের করতে পারলো না তার থেকে। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু মাসউদকে না বলে পারলো না বিষয়টা।

তিন,

প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ছুটিতে বাড়িতে গেলে আমার শরণাপন্ন হয় গ্রামবাসী। তুলে ধরে তাদের সুখ-দুঃখ ও সমস্যাবলীর কথা। চৌধুরী-ভূঁইয়ার সাইনবোর্ডধারী কিছুসংখ্যক মোড়লের হাতে জিম্মী হয়ে রয়েছে গ্রামের নিরীহ মানুষ। গ্রামের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার-আচার করে বেড়ায় তারা। সেই সুবাদে শালিসের নামে হাতিয়ে নেয় মোটা অংকের টাকা। গ্রামের সহজ-সরল মানুষের চাকরি-বাকরি, ক্ষেত-খামার ইত্যাদিতে ঝোঁপ বুঝে কুপ বসানোই তাদের প্রধান পেশা। এভাবেই খুঁজে ফেরে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম। কখনো কখনো শারীরিক, মানসিক নিপীড়নও ভোগ করতে হয় তাদের। মুখ বুজে সহ্য করতে হয় সব অত্যাচার। তাদের ক্ষমতার দাপটের উপর সাহস করে কিছু বলতে পারে না গ্রামের সহজ-সরল মানুষ। এই নির্মম পরিস্থিতিতে গ্রামের সার্বিক সমস্যাবলী নিয়ে পত্রিকায় রিপোর্ট করতে বলে আমাকে। পরিত্রাণ পেতে চায় তথাকথিত মোড়লদের জুলুম-নির্যাতন থেকে।

আমি তখন ঐ অসহায় চেহারাগুলোর উপর 'না' বলতে পারিনি। রিপোর্ট করার ওয়াদা করে ফেলি তাদের সাথে। তখন বিষয়টা নিয়ে আমি এতটা ভাবিনি। কিন্তু এখন আমাকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলছে বিষয়টা। গত দু'মাস আগে এধরনের আরেকটি ছোটখাটো রিপোর্ট করেছিলাম জাতীয় পত্রিকায়। সেজন্য আমাকে সেই চৌধুরী-ভূঁইয়াদের অনেক হুমকি-

ধমকি হজম করতে হয়েছে। বাড়িতে আম্মাকেও অনেক কটু কথা বলেছে। আমি আমার ব্যাপারে কোনোরূপ আশংকা করছি না। অন্যায়ের সাথে আপোস করার মানসিকতা আমার নেই। আমার বাবাও একজন আপোস-হীন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি অন্যায়ের সাথে আপোস করেননি কখনো। সেজন্য সংগ্রামী জীবনটা বিলিয়ে দিতে হয়েছে ঘাতকদের হাতে। এখন বাবার রক্ত আমার শরীরে বিদ্যমান। তার রক্ত টগবগ করছে আমার প্রতিটি রক্তকণিকায়, শিরা-উপশিরায়। কিন্তু আমি আশংকা করছি আমার নিরীহ মা ও বোনের জন্য। তারা বাড়িতে একা থাকে। কোনো পুরুষ প্রাণী নেই তাদের সাথে। কখনো তাদের কোনোরূপ ক্ষতি হয়ে যায় কিনা....।

মাসউদ ফয়সালকে থামিয়ে দিয়ে বললো–তোমার চিন্তা একেবারে অমূলক নয়। তবে একজন কলমসৈনিকের জীবনে ঝড়-ঝাপটা, বাধা-বিপত্তি আসতেই পারে। এসবের পরই উদিত হয় মুক্তির জরিন সূর্য। মধু আহরণ করতে হলে মধুপোকার হুলের বিষ হজম করতে হয়, গোলাপ তুলতে গেলে কাঁটার আঘাত সইতে হয়। অপারেশনের রোগীকে বাঁচাতে হলে শরীর কাটতে হয়, কখনো কখনো কেটে ফেলেও দিতে হয়। তদ্রুপ সমাজের দুর্নীতি দমনের অপারেশনে সফল হতে হলে কিছু স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে। তখনই সফলতা এসে ধরা দেবে কর্মনায়কের জীবনে। জীবনবাজি রেখেই এ পথে অগ্রসর হতে হবে। এ পথ অত্যন্ত কন্টকাকীর্ণ, অত্যন্ত দুর্গম। এ পথে যাত্রা করতে হয় একটু সন্তর্পণে। তাই তো কবি বলেছেন–

'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীতে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।'

সত্য পথের পথিকের সাথে সবসময় আল্লাহ আছেন এবং থাকবেন। সবসময় তাঁর পক্ষ থেকে গায়েবী মদদ আসতে থাকবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–'জা-য়াল হাক্কু ওয়াযাহাকাল্ বাতিল, ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা।' সত্য সমাগত মিথ্যা বিতাড়িত। আর মিথ্যা বিতাড়িত হওয়ারই বস্তু। তোমার মতো একজন সত্যসন্ধানী লেখককে জ্ঞান দেওয়া মানে মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প বলার সমান।

চার.

দেখতে দেখতে চলে এলো পরবর্তী সাহিত্য সমাগমের দিন। যথারীতি শামিল হলো ফয়সাল, মাসউদ ও অন্যরা। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হলো সমাগমের কার্যক্রম। তিলাওয়াতের পর ইসলামী সংগীতের জন্য নাম ঘোষণা করা হলো একজন সাথীর। সে দাঁড়িয়ে গাইতে লাগলো–

'ঈমানের পথ সেতো কাঁটায় ভরা
জিহাদের পথ সেতো মৃত্যু ঘেরা (২বার)
তবুও এগুতে হবে, জীবনটা বাজি রেখে (২বার)
ঈমান বাঁচাতে জিহাদেরই পথে.....।'

ইসলামী সংগীত শেষ হলে শুরু হয় লেখা পাঠের আসর। সাথীরা স্বরচিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ করে। পঠিত লেখার উপর আলোচনা, সমালোচনা করেন কয়েকজন বড়মাপের লেখক। সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা চলে কিছুক্ষণ। লেখকের অর্জনীয় ও বর্জনীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন একটি ইসলামী মাসিক পত্রিকার প্রথিতযশা সম্পাদক। ফয়সালের বিষয়টিও বাদ পড়েনি সেদিন। পরিশেষে মুনাজাত ও হালকা আপ্যায়নের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় সেদিনের সাহিত্য সমাগম।

পাঁচ.

মাসউদের সেদিনের কথা এবং সাহিত্য সমাগমের আলোচনা পর্যালোচনা দাগ কেটে যায় ফয়সালের হৃদয়বন্দরে। বিশেষ করে পরিবেশিত সংগীতের পঙক্তিগুলো দারুণভাবে আন্দোলিত করে তোলে তাকে। বিস্ফোরিত হয় হৃদয়তন্ত্রীতে জমানো ঈমানের বারুদগুলো। আর ক্যাপবদ্ধ রাখতে পারেনি তার ধারালো কলম। দেশের শীর্ষ জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয় একটি নজরকাড়া বস্তুনিষ্ঠ ফিচার–'গ্রাম্য মোড়লদের হাতে জিম্মী সৌরভনগরের নিরীহ মানুষ/ জুলফিকার ফয়সাল'। এই ফিচারের মাধ্যমে মুখোশ উন্মোচন হয়ে যায় গ্রাম্য মোড়লদের।

লেখাটি দেখে জ্বালাপালা শুরু করে তথাকথিত চৌধুরী-ভূঁইয়াদের গা। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে তারা। প্রতিশোধের অনল দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে তাদের পাপিষ্ঠ মনে। প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজতে থাকে তারা।

ছয়.

ফয়সাল তখনও মাদরাসায় অবস্থান করছে। ফয়সালকে না পেয়ে একদিন গভীর রাতে ঢুকে পড়ে ফয়সালদের ঘরে। নির্যাতন চালাতে যায় ফয়সালের মা ও কুমারী বোনের উপর। তখন ফয়সালের মা ও বোনের চিৎকারে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসে গ্রামের সহজ সরল মানুষ। পর্বতসমান শক্তিতে পরিণত হয় কতগুলো নিরীহ প্রাণ। যেন পারমাণবিক বোমা হয়ে বিস্ফোরিত হলো দীর্ঘদিনের জমানো দুঃখগুলো। সেদিনের মতো প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে গেল চৌধুরী-ভূঁইয়ার নাতি-পুতিরা।

এর দু'দিন বাদে জোরালো রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এর উপর। নারী নির্যাতনের দায়ে হ্যান্ডকাপে জড়িয়ে যায় মোড়লেরা। কেউ কেউ বেছে নিল পলাতক ও নির্বাসিত জীবন। অবসান ঘটে তাদের জুলুম-নির্যাতনের। ফিরে আসে সৌরভনগরের হারানো সৌরভ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গ্রামের সহজ সরল মানুষ। তারা প্রাণভরে দোয়া করতে থাকে ফয়সালের জন্য। একটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদনার দায়িত্ব পায় ফয়সাল। দুর্বার গতিতে চলতে থাকে তার কলম। ❐

স্বার্থহীন উপকার

এক.

কোম্পানীগঞ্জ একটি প্রসিদ্ধ স্টেশন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের সুব্যবস্থা রয়েছে সেখান থেকে। কোম্পানীগঞ্জ থেকে সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে নবীনগর রোড। সে রোড বেয়ে আট কিলোমিটার এলেই বাংগরা স্টেশন। কোম্পানীগঞ্জ টু নবীনগর বাসগুলো দশ মিনিট লেট করে সেখানে। স্টেশন থেকে সিকি কিলোমিটার পশ্চিমে রয়েছে সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা একটি আদর্শ গ্রাম। সে গ্রামের আবদুল বারেক সাহেব খুবই ভাল লোক। আট-দশজনের জনক তিনি। তাঁর দ্বিতীয় ছেলে আবুল কালাম আজাদ। সে মাদরাসায় পড়ে। বাড়ির সবাই তাকে কালাম বলেই ডাকে। খুব ভাল ছেলে সে। গাঁয়ের অন্য পাঁচটা ছেলের মতো নয়। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে মা-বাবার কাজে সহযোগিতা করে। মানুষের উপকার করার জন্য সদা সচেষ্ট থাকে। গাঁয়ের ভদ্র ছেলেদের নিয়ে সে অনেকগুলো উন্নয়নমূলক কাজও করেছে। তাই গাঁয়ের ছোট বড় সবাই তাকে ভালবাসে এবং বিশ্বাস করে।

কালাম গাঁয়ের মাদরাসা থেকে দাখিল পাস করে সোনাকান্দা দারুল হুদা কামিল মাদরাসায় ভর্তি হয়েছে দু'মাস আগে। মাদরাসাটি কালামদের গ্রাম থেকে তিন কিলোমিটার উত্তরে। সোনাকান্দা কামিল মাদরাসা অনেক মশহুর মাদরাসা। দেশের অন্য দশটা সরকারী মাদরাসা থেকে ব্যতিক্রম। লেখাপড়া বেশ ভাল হয় সেখানে। এমনটি হওয়ারই কথা, মুফতী ও

মুহাদ্দিস পদে নিয়োগ পেয়েছেন বেশ ক'জন কওমী মাদরাসার আলেম। তাই সেখানকার প্রশাসন খুব কড়া। ছাত্ররা অন্যান্য আলিয়ার মতো ফাঁকি ঝুকি দিতে পারে না। সেখানকার ছাত্র ও শিক্ষকদের পোশাক-আশাকও কওমী মাদরাসার মতো শালীন ও মার্জিত।

দুই.

কালাম মাদরাসা কামাই করে না। নিয়মিত হাজিরা দেয় সে। এমনই একদিন সে মাদরাসায় যাচ্ছে। মুহাম্মদপুর পেরিয়ে যেতে হয় সোনাকান্দা আলিয়ায়। সে গ্রাম দিয়ে বয়ে গেছে একটি মাঝারি গাঙ। গাঙের উপর কাঠের পুল। সেই পুলটি বেয়ে যেতে হয় সোনাকান্দা যাত্রীদের। কালাম সেখানে পৌঁছে দেখে ছোট ছোট দূরন্ত ছেলেরা পুল থেকে গাঙে লাফ-ঝাঁপ খেলছে। তাদের দেখাদেখি একটি নাদুস নুদুস পিচ্চিও পুল বেয়ে পাঁচ-ছয় গজ চলে এলো। কালামও তখন পুল পাড় হচ্ছিল। সে পিচ্চির কাছাকাছি পৌঁছে গেল। পুলে না চড়ার জন্য কালাম পিচ্চিটাকে আদরমাখা কণ্ঠে কয়েকবার বারণ করেছে। সে কালামের কথা শুনেনি। অন্য ছেলেদের ঝাঁপের ঝটকানিতে হঠাৎ পিচ্চিটা গাঙে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকে। কালাম তখন কিংকতর্ব্যবিমূঢ় হয়ে এক গাদা কিতাব নিয়েই পিচ্চিটার জন্য গাঙে ঝাঁপ দিল। এরই মধ্যে তার পেটে কয়েক গ্লাসের মতো পানি ঢুকে গেল। কালাম পিচ্চিটাকে তীরে তুলে আনলো। তখন আশপাশের ছেলে-মেয়েরা সেখানে এসে জড়ো হলো। পিচ্চির মা-বোনেরা খবর পেয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে এলো। চুমো খেতে খেতে বলতে লাগলো–'বাবা তুমি এ্যানো কিয়ের লাইগা আইছিলা, ঐ মুন্সী বাজানে না থাকলে দো আমার বাছাধন শেষ অইয়া যাইতো গো, আমার মনুডার যানি আজ্জা কি দশা অইতো গো....।'

: না খালাম্মা! আল্লাহ তাআলাই তাকে রক্ষা করেছেন। আমি উসীলা মাত্র।

: তোমার কী নাম বাজান? তুমি কোন গাঁওয়ের?

: আমার নাম আবুল কালাম আজাদ। বাবার নাম আবদুল বারেক। খামার গ্রাম উত্তরপাড়া আমাদের বাড়ি।

: আইচ্ছা বাইত আইও বাজান, কাপড়-চোপড় বদলাইয়া লও, তোমার যানি কতো কষ্ট অইছে।

: না খালাম্মা! আমার কোনো কষ্ট হয়নি। আল্লাহ তাআলা আমার মাধ্যমে এমন একটি কাজ করিয়েছেন, সেজন্য তাঁর দরবারে নিযুত কোটি শুকরিয়া। বাড়িতে এখন আর যাবো না, মাদরাসার সময় হয়ে যাচ্ছে। খালাম্মা! আপনাদেরকে দু'টি কথা বলি, এরকম ছোট ছোট ভাই-বোনদেরকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। তাদের প্রতি সবসময় সর্তক দৃষ্টি রাখতে হয়। কারণ বর্তমানে চারদিকে ছেলেধরা, মেয়ে চোরসহ বিভিন্ন প্রকার মানুষরূপী জানোয়ার এখানে সেখানে ওৎপেতে বসে থাকে। কখন কি দুর্ঘটনা ঘটে যায় বলা যায় না। তাছাড়া এই এলাকা হচ্ছে পানিমাতৃক এলাকা, এসব এলাকায় বসবাস করতে ছোট ছোট ভাই-বোনদের ব্যাপারে খুবই সাবধান থাকতে হয়। খালাম্মা! আপনাদেরকে অনেক কথা বলে ফেললাম, বেয়াদবি হলে মাফ করবেন।

: আমডারে আর শরম দিও না বাজান।

: খালাম্মা! আমি এখন আসি, আমার জন্য দোয়া করবেন।

: রহমানুর রহীমে তোমার আশা পূর্ণ করুন।

: কালাম ভাই আপনি একদিন সময় করে আমাদের বাড়িতে বেড়িয়ে যাবেন।–বললো পিচ্চির বড় বোন লুৎফা।

: সুযোগ পেলে চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

তিন.

ভাবতে ভাবতে কালাম মাদরাসার দিকে রওয়ানা হলো। আজ তার পৌঁছতে বিশ মিনিট দেরি হয়ে গেল। কালামের গাঁ-গতর ও কিতাবাদির এ অবস্থা দেখে শ্রেণীশিক্ষক তার কারণ জানতে চাইলে সে তার ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলো। তিনি কালামের ঘটনা শুনে খুব খুশি হলেন এবং তার জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করলেন। তারপর তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন– 'তোমরাও কালামের মতো নিঃস্বার্থভাবে মানুষের উপকার করবে, সেবা করবে। মানুষকে সেবা করতে পারলে আল্লাহকে সেবা করা হয়, এতে তিনি খুব খুশি হন। যুগে যুগে পৃথিবীতে উদার ও মহৎ প্রাণের অধিকারী সেবাব্রতী মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাদের মহৎ বাণীসমূহ অনুপ্রাণিত

করেছে হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে। তোমাদের এ কথাটি জানা থাকা প্রয়োজন যে–দয়া, সত্য ও কল্যাণ এ তিনটি হলো সত্যিকার মানবজীবনের আদর্শ। নবী-রাসূলগণ আল্লাহর বাণী নিয়ে পৃথিবীতে এসে সর্বাগ্রে যে পাঠ দিয়েছেন তা হলো 'মানুষকে ভালবাসো।' মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের মহান নীতি-আদর্শ তারা অম্লান অনির্বান করে রেখে গেছেন, সে সত্য মানুষকে ভালবাসার মধ্যেই মূর্ত হয়। গীতিকার যথার্থই বলেছেন–

'তাঁর ভালবাসা যদি পেতে চাও
তবে মানুষেরে ভালবেসে যাও...।'

তোমরা তো অবশ্যই জানো যে, আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সেবক। বস্তুতঃ তাঁর পুরো জিন্দেগীটাই ছিল সমাজ সেবার অনন্য উদাহরণ। তিনি কিশোর বয়সেই মানবতাবাদী সংগঠন 'হিলফুল ফুজুল'-এর অন্যতম সংগঠন ছিলেন। আবার তিনিই বলে গিয়েছেন–'মানুষের মাঝে তিনিই শ্রেষ্ঠ যিনি মানুষের উপকার করেন।' কালাম মানুষের উপকার করে, সুতরাং সে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ। তোমরা কি কালামের মতো মানুষের উপকার করে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে চাও না? সবাই সমস্বরে বলে উঠলো–জ্বী হুজুর। এমন সময় প্রথম প্রিয়ডের সমাপ্তি ধ্বনি বেজে উঠলো ঢং.....। ❐

কলা শাহ'র গায়েবী মাজার

এক.

বকুলতলা বাস স্টেশন। কয়েকটি দোকান নিয়ে গড়ে উঠেছে একটি ছিমছাম বাজার। গভীর রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন হলো দশ-বার বছরের এক দোকানের বেয়ারার। বেগ সামলাতে না পেরে সদর রাস্তার পাশেই প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করলো বেচারা।

ভোর হতেই ক্ষুদে ব্যবসায়ীদের আনাগোনা বাড়তে লাগলো বকুলতলা স্টেশনে। দুর্গন্ধ সইতে না পেরে গুঁড়ো মাছ দিয়েই ঢাকনা দিল এক মাছওয়ালা। এতেও যথেষ্ট না হলে শাক-সবজি দিয়ে শরীক হলো আরেক তরকারীওয়ালা। পরবর্তীতে আজনবী পথচারিরা ভাবলো–এখানে হয়তো বরকতময় কিছু ঘটেছে, তাই নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের নিয়তে সেখানে নজর-নেয়াজ ঢালতে লাগলো টাকা-পয়সা এটা-সেটা দিয়ে। এভাবে ধর্মান্ধ মানুষের উপচেপড়া ভিড় পড়তে লাগলো সেখানে। আর তা থেকে ফায়দা লুটতে লাগলো একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মানুষ।

দুই.

একদিন স্বার্থান্বেষী লোভী মানুষেরা পরামর্শে বসলো। সেখানে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন প্রকার মতামত পেশ করলো। একজন বলে উঠলো–এভাবে চলতে থাকলে ব্যবসা তেমন জমজমাট হবে না। সেখানে যদি আরো কিছু

কারামতি জাহির করা যায়, তাহলে ব্যবসা আরো জমজমাট হয়ে উঠবে। পরামর্শক্রমে তারা একজোড়া মোটাতাজা কলাগাছ কাটলো। গাছ দু'টি সাড়ে তিন হাত পরিমাণে সাইজ করে কেটে নিল। তারপর রাতের আঁধারে গর্ত করে সেখানে গাছ দু'টি সমান্তরালভাবে শুইয়ে দিল এবং তার উপর দুইমন চিড়া ঢেলে দিয়ে হালকাভাবে মাটিচাপা দিয়ে দিল।

কলাগাছের আর্দ্রতা পেয়ে চিড়াগুলো ভিজে উঠলো। ফলে উপরের মাটি ধীরে ধীরে ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগলো। দু'দিনের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো, 'বকুলতলা স্টেশনে গায়েবী মাজার গজিয়েছে।' স্বার্থান্বেষী মাজার ব্যবসায়ীরাও ঝোঁপ বুঝে কুপ মারলো। তারা 'কলা শাহ'র গায়েবী মাজার' নামে একটি বড়সড় সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিল। এখন ধর্মান্ধ মানুষেরা কেউ নজর-নেয়াজ নিয়ে সেখানে ভিড় জমাচ্ছে, কেউ কলা শাহ'র কাছে নিজের ইচ্ছা পূরণের প্রার্থনা করছে, কেউ মাজারে সিজদা করছে। আবার মাজার ব্যবসায়ীরাও গাড়ি থামিয়ে কলা শাহ'র নামে চাঁদা আদায় করছে বাৎসরিক ওরশের নামে। এভাবে দিন দিন তা মশহুর হয়ে উঠতে লাগলো।

তিন.

কলা শাহ'র গায়েবী মাজারকে কেন্দ্র করে দিনে দিনে তাদের ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠলো। ব্যবসা আরো রমরমা করে তোলার জন্য তারা একজন গদিনিশীন পীরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো। প্রয়োজন অনুযায়ী পেয়েও গেল। নাম শাহসূফি হযরত খাজা রওশন গাজী বাগদাদী মুজাদ্দেদী। এটা অবশ্য পীর সাহেবের প্রকৃত নাম নয়। প্রকৃত নাম রোশন মিয়া। বাবা-মা ও প্রতিবেশীরা এ নামেই ডাকেন। রোশন মিয়া নাকি খুব উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিল। তার নামে বাবা-মা'র কাছে প্রচুর নালিশ আসতো। তার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে বাবা-মা তাকে বাগদাদ পাঠিয়ে দেন। বছরখানেক বাগদাদ ঘুরে এসে তার নামে বর্তমান পরিবর্তন এনেছেন। আর সহজ সরল মুসলমানদের আকৃষ্ট করতে নামের আগাগোড়ায় এ টাইটেলগুলো সংযুক্ত করে নিয়েছেন।

চার.

খানকা শরীফের আলীশান গদিতে বসে পড়লেন পীর সাহেব। তার খেদমতে নিয়োজিত দু'পাশে দু'জন পরমা সুন্দরী। যে কোনো সাক্ষাৎপ্রার্থীকে প্রথমেই সিজদায় লুটিয়ে পড়তে হয় পীর সাহেবের কদমে। চুষে বরকত নিতে হয় পদযুগলের আঙ্গুলি থেকে। মাজারে নজর-নেয়াজ আসার পাশাপাশি হাদিয়া তোহফা আসতে লাগলো পীরের দরবারেও। তিনি খানকায় বসে শত সমস্যার তদবীর করে তকদীর ফেরাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

খানকার বেঞ্চপাতা বারান্দায় বসতে হয় সমস্যাজর্জরিত ভক্ত-অনুরক্তদের। সাক্ষাৎরুমের প্রবেশদ্বারে রয়েছে পীরের খাস খাদেম। সর্বপ্রথম এ খাদেমই কৌশলে জেনে নেয় সাক্ষাৎপ্রার্থীর নাম-ঠিকানা ও সমস্যার কথা। সে-ই পীরের কাছে আগাম জানিয়ে দেয় পূর্ণ হাল-বৃত্তান্ত। সাক্ষাৎপ্রার্থী খানকায় প্রবেশ করতেই পীর সাহেব তার সমস্যার কথা অকপটে বলে ফেলতে দেখে তার প্রতি ভক্তি আরো বেড়ে যায়। এখানেই পীর সাহেবের কারামতি।

পাঁচ.

আর্থিক সমস্যা নিয়ে হাজির হলো এক মুরীদ। পীর সাহেব তার হাল-বৃত্তান্ত শোনার আগেই বলে ফেললেন আগাম সংবাদ অনুযায়ী। তারপর তিনি বললেন–

"রবে না তুমি দুখী
হবে চিরসুখী,
ছুটতে হবে না অর্থের পিছু
অর্থ ছুটবে তোমার পিছু,
আগামী পূর্ণিমা রাতে
সোনার কলসি ভিড়বে তোমার ঘাটে।

তবে এজন্য তদবীর ফি বাবত দশ হাজার টাকা দিতে হবে এবং নিয়মানুযায়ী চলতে হবে।"

মুরীদ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলো পীরের কথাগুলো এবং ভবিষ্যত অর্থের লোভে অনেক কষ্টে যোগাড় করে দিল পীর সাহেবের চাওয়া টাকা। পীর তার খাস খাদেমের মাধ্যমে চুপিসারে একটি সিলভারের কলসি রেখে দিয়ে এলো মুরীদের ঘাটে। মুরীদ বেচারা এ কলসিই তুলে আনলো পূর্ণিমা রাতে। পরবর্তীতে পীর সাহেবকে এ কথা জানালে, 'নিয়ম ভঙ্গ করেছো' বলে বের করে দেয় পীর সাহেবের আস্তানা থেকে।

আরেক নিঃসন্তান নারী মুরীদ এলো সন্তান লাভের আশায়। পীর সাহেব ঠোঁট নেড়ে কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে বলে উঠলেন–'সন্তান পেতে হলে আমার শয্যার সাথী হতে হবে।' অবলা নারী এ কথা শুনে অপমানে ক্ষোভে পীরের দরবার ত্যাগ করলো।

ছয়.

পবিত্র ঈদুল আজহা সমাসন্ন। কুরবানী সংক্রান্ত ফাতওয়ার জন্য গ্রাম থেকে এক মূর্খ বৃদ্ধ এলো বাগদাদী পীরের দরবারে। সাথে নিয়ে এলো বৃদ্ধের এক ছোট নাতি। বৃদ্ধ জানতে চাইলো–আমার পুতের বউ, মানে এই নাতিডার মা একটা রাঁতা মোরগা পাইল্যা এত্তারা বড় করছে। এত্তো বড় রাঁতা অয়না হুজুর। অহন সামনে দো কুরফানী আইতাছে। তয় হেই রাঁতাডা দিয়া কুরফানী দেওঅন জায়েয অইবো নি। আপনেরার মসলায় কী কয়? আমারে কইয়া দেন, তার মায় পাডাইছে.....।

এ কথাগুলো বলতে বলতে বৃদ্ধ প্রস্রাব করে দিল পীরের খাস কামরায়-ই। বৃদ্ধকে প্রস্রাব করে দিতে দেখে তার নাতি বললো–দাদা! এইডা কী করলেন? আপনে দো পীস্সাবের দরবার নাপাক কইরা দিলেন, অহন.....।

পীর সাহেব তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন–কোনো সমস্যা নেই, বৃদ্ধ মানুষের প্রস্রাব পাক। তারপর পীর সাহেব কিছু সাজানো কিতাব ঘেঁটেঘুঁটে ফাতওয়া দিয়ে দিলেন– জায়েয আছে, বতরীকে আওলা জায়েয আছে। আপনারা এ মোরগ কুরবানী দিতে পারবেন।

সরলমনা বৃদ্ধ পীর সাহেবের প্রতি খুশি হয়ে পীরের খাদেম–খুদ্দামসহ মীলাদ শরীফের দাওয়াত করে আসলো। দাওয়াত খেতে পীর সাহেব

যথাসময়ে হাজির হলো বৃদ্ধের বাড়িতে। ঘরে ঢুকতেই কয়েকবার ছ্যে... ছ্যে... ছ্যে... শব্দ করে আসন নিয়ে বসে পড়লেন তিনি। বৃদ্ধের স্ত্রী এরূপ শব্দ করার কারণ জানতে চাইলে পীরের খাস খাদেম বললো–'কাবা শরীফে কুকুর ঢুকছিল, বাবা এখান থেকে সে কুকুর তাড়িয়ে দিলেন।' তৎক্ষণাতৎ খাদেম-খুদ্দামরা সমস্বরে বলে উঠলো সুবহানাল্লাহ।

বৃদ্ধের পুত্রবধূ ছিল খুব চতুর ও বুদ্ধিমতি। সে পীর সাহেবের কারামতি পরখ করার জন্য খাদেমদেরকে কলিজা ভূনা পরিবেশন করলো প্রচলিত নিয়মে। আর পীর সাহেবকে দিল ভাতের নিচে। খাদেমরা কলিজা ভূনার লোভ সামলাতে না পেরে আয়েশ করে খেতে লাগলো। পীর সাহেব খাচ্ছে কি না সেদিকে কারো ভ্রুক্ষেপ নেই। পীর সাহেব বসে বসে ভাবছেন–তাকে আরো উন্নত খাবার দেওয়া হবে। একসময় বৃদ্ধ পীর সাহেবের তরকারীর কথা বললে তার পুত্রবধূ আড়াল থেকে বলে উঠলো–পীর সাহেব এখান থেকে কাবা শরীফের কুকুর তাড়াতে পারেন, আর ভাতের নিচের কলিজা ভূনা দেখেন না, এইটা কেমুন কথা। তৎক্ষণাৎ পীর সাহেব বৃদ্ধের বাড়ি থেকে দ্রুত কেটে পড়লো।

সাত.

বাগদাদী পীরের পরপর কয়েকটি ঘটনায় সহজ সরল মুসলমানদের বিবেকের দ্বার খুলে গেল। সোচ্চার হয়ে উঠলো ধর্মপ্রাণ মুসলমান। ছুটে এলো সামাজিক সংগঠন আল-এহসান পরিষদের নেতৃবৃন্দের কাছে। তথাকথিত বাগদাদী পীরের অনৈসলামিক কার্যকলাপের একটা সুরাহা করতে। বিহিত ব্যবস্থা করতে পীরপূজা, মাজারপূজা বন্ধের।

পরিষদের চেয়ারম্যান এইচ.এম. জানে আলম কার্যনির্বাহী সদস্যদের নিয়ে এব্যাপারে জরুরী মিটিং ডাকলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইসলামী মহাসম্মেলনের আয়োজন করলেন টাউন হল ময়দানে। ব্যাপক সাড়া পেলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের। দাওয়াত করলেন শীর্ষস্থানীয় হক্কানী উলামায়ে কিরামদের। আলোচনা করলেন বিভিন্ন বিষয়ে। বাদ পড়লো না পীরপূজা, মাজারপূজা প্রসঙ্গও। উলামায়ে কিরাম বলেন–আমাদের দেশের

ধর্মপ্রাণ সহজ-সরল মুসলমানদের অনুভূতিকে পুঁজি করে বিভিন্ন প্রকার পূজার মতো শিরক ও কুফুরী কাজ তথাকথিত নামধারী পীর-দরবেশ ও তাদের দরগাহকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হচ্ছে। অথচ কবরে দরগাহ প্রস্তুত করা, বাতি জ্বালানো, চুমা দেওয়া, হাত রেখে ঐ হাত মুখে পেটে মালিশ করা, কবরে শায়িত মানুষের কাছে নিজেদের ইচ্ছা পূরণের প্রার্থনা করা, তার নামে নজর-নেয়াজ মানা এবং কবরে সিজদা করা এসবকিছুই কবরপূজার শামিল। এসব ইসলামবিরোধী কাজ হারাম ও নাজায়িয। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব নিষেধ করেছেন।

প্রায়ই দেখা যায়, এদেশের মুসলমানরা বিভিন্ন নিয়তে বিভিন্ন মাজারে ভিড় জমায়। কবরে সমাধিস্ত মানুষের কাছে সন্তান ইত্যাদি কামনা করে। অথচ এ কাজ যে কত বড় শিরকের শামিল সে ব্যাপারে তারা অনবগত। কারণ মানুষ যখন মরে যায়, সে যত বড় আল্লাহওয়ালা হোক না কেন, তার আর কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। আর কিয়ামতের দিন শুধু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সকল উম্মতের জন্য সুপারিশ করবেন। কিন্তু বর্তমানে তথাকথিত পীরেরা মুসলমানদের সরলতার সুযোগ পেয়ে তাদের থেকে মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র বলে এবং ভুল ফাতওয়া দিয়ে সমাজে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। বিভিন্ন পলিসির মাধ্যমে নিজেদের বুযুর্গী জাহির করছে।

প্রিয় ভাইয়েরা! আপনারা কি কখনো এসব ভণ্ড পীরদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন? উপস্থিত সবাই সমস্বরে বললো– জ্বী না। সাথে সাথে শ্লোগান উঠলো–'ভণ্ড পীরের আস্তানা–এই বাংলায় রাখবো না'। আলোচক আরো বলতে লাগলেন–বর্তমানে অধিকাংশ মাজারই গড়ে উঠেছে বাস স্টেশনে। কারণ সেখানে ব্যবসা ভাল জমে। আর সে সুবাদে দিন দিন মুশরিক তৈরি হচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সূরাহ নিসার ৪৮ নাম্বার আয়াতে ইরশাদ করেছেন–"নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করার যে গুনাহ তা তিনি ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্য যে কোনো গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো উদ্ভাবন করে নিয়েছে এক গুরুতর গুনাহ।"

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় যে বৃক্ষের নিচে বাইয়াত নিয়েছিলেন তা দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু কেটে ফেলার হুকুম করেন। কারণ সাধারণ লোক সে বৃক্ষের কাছে যাতায়াত ও নামায পড়া শুরু করে দিয়েছিল। তাই তিনি ভবিষ্যত বিপদাশংকা করে এ নির্দেশ দেন। এ কাজে সাহাবীদের কেউ প্রতিবাদ করেননি। অথচ 'বাইয়াতে রিদওয়ান' ইসলামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা এবং উক্ত বৃক্ষ সে স্মৃতি বহন করছিল।

তেমনিভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরীফ থেকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর প্রতিমূর্তি নিজ হাতে ভেঙে দিলেন। এ কাজ ছিল তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের বহিঃপ্রকাশ, বেয়াদবি নয়। অতএব, আপনারা কি এসব পীরপূজা, মাজারপূজার মূলোৎপাটন করতে রাজি আছেন? সম্মেলনে উপস্থিত সবাই সমস্বরে বলে উঠলো–জ্বী....।

আবার চারদিকে শ্লোগান উঠলো–'পীরপূজা মাজারপূজা–বন্ধ কর করতে হবে। কলা শাহ'র মিথ্যা মাজার–উৎখাত কর.....।' শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠলো টাউন হল ময়দান। পরিশেষে পীরপূজা, মাজারপূজা বন্ধের দীপ্ত শপথের মধ্য দিয়ে শেষ হলো ইসলামী মহাসম্মেলন। ❐

বাইরে মানুষ ভেতরে পশু

এক.

বৃষ্টিপুরের ফিরোজ মিস্ত্রী নেহায়েত গরীব। দিনে এনে দিনে খান। বৌ-বাচ্চা নিয়ে অনেক কষ্টে দিনাতিপাত করেন তিনি। এত কষ্টের পরও সন্তানদের লেখাপড়া শেখান। তার বড় মেয়ে তাহসীনা নবমের ছাত্রী। লেখাপড়া, রূপগুণ কোনোটাতেই তার জুড়ি নেই। তার নামের সাথে রূপের যথেষ্ট মিল রয়েছে। তার রূপে বিমুগ্ধ হয়ে পড়শীরা 'গোবরে পদ্মফুল' বলে আখ্যায়িত করে থাকে। এ পর্যন্ত ডজনখানেক প্রার্থী প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ সে ওসবের ধার ধারে না।

কিছুদিন ধরে তাহসীনার পেছনে ঘুর ঘুর করছে এলাকার এক পয়সাওয়ালার ছেলে জাহাঙ্গীর। অন্য মেয়েদের মতো তাহসীনাও তার লোলুপ দৃষ্টি এড়ায়নি। সে তাকে মনের কথা বলার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।

দুই.

একদিন স্কুল শেষে তাহসীনা তার বান্ধবীদের সাথে বাড়ি ফিরছে। সুযোগ বুঝে জাহাঙ্গীর তাদের পথ রোধ করে বসে। তাহসীনাকে বান্ধবীদের থেকে একটু আলাদা করে তাকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। প্রতিউত্তরে–'আমি ওসবের ধার ধারি না। সুতরাং আর কোনোদিন এভাবে আমার পথ রোধ করবেন না' বলে সেখান থেকে কোনো রকমে ছুটে এলো।

জাহাঙ্গীর তাহসীনার কথাগুলো মেনে নিতে না পেরে যে কোনো উপায়ে তাকে প্রেমে বাধ্য করার দৃঢ় সংকল্প করলো। এরপর সে এখানে সেখানে তাহসীনাকে বিরক্ত করতে থাকে। তাহসীনাও এর বিনিময়ে কতগুলো কড়া কথা শুনিয়ে চলে আসে। জাহাঙ্গীর তার কথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলতে থাকে।

তিন.

অন্য একদিন তাহসীনা স্কুল থেকে একাকি বাড়ি ফিরছে। সুযোগ বুঝে জাহাঙ্গীর তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে তাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করে। তখন তাহসীনার চিৎকারে আশপাশের কিছু লোক জড়ো হয়ে যায়। তাই ওরা সেদিন পালিয়ে যায়। ব্যর্থতার গ্লানি সহ্য করতে না পেরে তার শিরা-উপশিরা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। হাতের নাগালে পেয়েও কিছু করতে না পেরে ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাকে সে। সুযোগ খুঁজতে থাকে প্রতিশোধ নেবার।

চার.

রাত তখন সাড়ে নয়টা। নিকষ আঁধার নেমে এসেছে পল্লীর গলিপথে। পল্লীর নিয়ম অনুসারে বেশির ভাগ মানুষই তখন নিদ্রাপুরীতে। তাহসীনা পড়ার টেবিলে বসে আছে। বইয়ের পাতায় তার মন। একপাশে তার ছোট ভাই তাসনীম। জাহাঙ্গীর এমন অন্ধকার গলি ভেঙে রাক্ষুসের মতো এগিয়ে গেল তার প্রতিশোধ নিতে। একসময় পৌঁছে গেল তাহসীনাদের বাড়ির সীমানায়। সে এক হাতে টেনে ধরলো ঘরের দরজা, অন্য হাতে স্বজোরে নিক্ষেপ করলো এক কৌটা বিষাক্ত এসিড। তৎক্ষণাৎ একসাথে চিৎকার করে উঠলো দু'টি প্রাণ। তাদের চিৎকারে এগিয়ে এলো মা-বাবা। জেগে উঠলো পাড়া-পড়শী। বিষাক্ত এসিড ছিনিয়ে নিল তাসনীমের দৃষ্টিশক্তি। ঝলসে গেল তাহসীনার সুন্দর মুখবয়ব। ওদের বাবা আর্তনাদ করে বলে–'আমার ছেলে-মেয়েরা কী দোষ করেছিল তাদের কাছে।' ❐

গরীব বলে দুঃখ নেই

.....

এক.

পল্লী এলাকা। হিজরী রমজান মাস। ছেলে বুড়ো সবাই রোযা রেখেছে। ধীরে ধীরে পশ্চিমাকাশ লাল হয়ে আসছে। সূর্যটা পশ্চিমাকাশ বেয়ে বৃক্ষের ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। পল্লীর চারদিকে সন্ধ্যা নেমে আসছে। ছেলেরা খেলার শেষে মাঠ ছেড়ে নিজ নিজ বাড়ি ফিরছে। দশ-এগার বছরের শায়েরও অজু করে তাদের ছোট্ট কুটিরে ফিরলো।

গত দু'বছর ধরে সে রোযা রেখে আসছে। এবার সবগুলো রোযা রেখেছে। তার বাবা নেই। সে খুব গরীব। দু'বছর আগে তার বাবা এক দুর্ঘটনায় মারা যান। তার মা আছেন। শায়েররা তিন ভাই-বোন। সে সবার বড়। গাঁয়ের মাদরাসার চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। লেখাপড়ায় ক্লাসের ফাস্ট বয়। স্বভাব-চরিত্রও বেশ ভাল। পাড়ার দুষ্ট ছেলেদের সাথে সে মিশে না। পল্লীর লোকেরা তাকে ভাল বলে জানে। তার ছোট বোন জোসনা ও হোসনা। শায়েরের মা হাতের কাজ জানেন। কাঁথা সেলাই, জামা তৈরি, জাল বুনা ইত্যাদি কাজ করে যা পান, তার দিয়েই শায়েরদের নিয়ে কোনোরকমে দিন কাটান।

দুই.

মাগরিবের আজান শুনে ইফতার করে লোকেরা নামায আদায় করতে মসজিদে যাচ্ছে। শায়েরও সামান্য ইফতার করে মসজিদে গেল। নামাযের পর শায়ের নীরবে ঘরে ফিরে এলো। আজ রোযা শেষ হয়েছে। কাল ঈদুল

ফিতর। চাঁদ দেখার জন্য সবাই পশ্চিমাকাশে নজর বুলাচ্ছে। শায়েরকে তার মা ঘরে বসে থাকতে দেখে বললেন– সবাই চাঁদ দেখছে, তুমিও গিয়ে দেখে আসো।

শায়ের বললো– না আম্মা আমার ভাল লাগছে না, আমি যাবো না।

তার মা আর কোনো কথা বলেননি। তিনি ছেলে সম্পর্কে জানেন যে বেশি কথা বললে জেদ ধরে বসবে। শায়েরের বাবা মারা যাবার পর তার মা তাদেরকে খুব আদর-যত্ন করেন। শায়েরের মা তাদেরকে খেতে ডাকলেন। মা সহ তিন ভাই-বোন এক সাথে খেতে বসলো। শায়ের আজ কোনো কথা না বলে নীরবে খেয়ে উঠে গেল। বাবার কথা আজ তার কচি মনে বার বার স্মরণ হচ্ছে, তাই আজ তার খারাপ লাগছে। শায়েরের মা তাকে এমনটি করার কারণ জিজ্ঞেস করেন। শায়ের তার মাকে ভাল না লাগার কথা জানিয়ে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে দীনিয়াত বইখানা খুললো। কিন্তু আজ তার পড়া হলো না। তার কেন ভাল লাগছে না, সে কথা সে না বললেও তার মা'র বুঝতে বাকি রইলো না। শায়েরের মা তাকে ইশার নামায পড়ে শুতে বলে নিজেও নামায পড়ে শুয়ে পড়লেন। শায়ের মায়ের কথা মতো নামায পড়ে মায়ের একপাশে এসে শুয়ে পড়লো। মা তার গায়ে কাঁথা জড়িয়ে দিলেন। তিনি আলো নিভিয়ে বললেন– রাত পোহালে ঈদ। কাল ভোরে যাকাত-ফিতরার জন্য আমার সাথে বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। শায়ের বললো–অবশ্যই যাবো আম্মা! আমিই যাবো। আপনাকে কষ্ট করে যেতে হবে না।

শায়েরের কথা শুনে তার মা খুশি হয়ে বললেন– না বাবা, আমাকে যেতে হবে, আমি যতটুকু পারবো, তুমি তা পারবে না। তুমি আমার সাথে থাকবে। এখন ঘুমিয়ে পড়ো কাল ভোরে উঠেই ইন্‌শাআল্লাহ বেরিয়ে পড়বো।

এতক্ষণে জোসনা ও হোসনা ঘুমিয়ে পড়েছে। শায়েরের চোখের পাতায় আজ ঘুম আসছে না। বার বার শুধু তার বাবার কথা মনে পড়ছে। সে কচি মনে ভাবতে থাকে–আজ যদি আমার আব্বা বেঁচে থাকতেন, তাহলে আমি ও জোসনা আব্বার দু'হাত দু'জনে ধরে ঈদগাহে যেতাম, কত মজা হত .....। ভাবতে ভাবতে সে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে বলতে পারবে না। ফজরের আজান হলে শায়েরের মা তাকে নামায পড়তে ডেকে নিজেও নামাযে দাড়ালেন। শায়ের আজ এক ডাকে উঠে নামায পড়তে গেল। নামাযান্তে শায়ের বাবার জন্য দোয়া করলো। শায়েরের মা-ও স্বামীর জন্য

কেঁদে কেঁদে দোয়া করলেন। নামায সেরে কাকডাকা ভোরেই শায়ের ও তার মা বেরিয়ে পড়লো।

তিন.

জোসনা ও হোসনাকে তারা ঘরে রেখে গেল। বাইরে ছেলে-মেয়েদের ঈদের আনন্দের হৈ-হুল্লোড় শুনে তারাও বাইরে গেল। হঠাৎ তাদের দু'জনকে নাঈমের নজরে পড়লো। নাঈম শায়েরের বন্ধু। সে পাড়ার বড়লোকের ছেলে। খুব ভাল। দু'জনে এক সাথেই লেখাপড়া করে। নাঈম জোসনা ও হোসনাকে নাঈমদের ঘরে নিয়ে খাওয়ালো এবং শায়ের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো।

সকাল সাড়ে আটটায় শায়ের ও তার মা ফিরে এলো। নয়টায় ঈদের জামাত, তাই শায়ের জলদি গোসল সেরে নিল। নাঈম শায়েরকে তাদের ঘরে খাওয়াতে নিয়ে গেল। সে যেতে চায়নি, নাঈম তাকে অনেক জোর করে নিয়ে গেল। দু'জনে খেয়েদেয়ে ঈদগাহে গিয়ে জামাত পড়ে ফিরে এলো।

চার.

শায়েরের মা সামান্য রান্নার কাজ সেরে ঘর গুছাচ্ছেন। শায়ের এসে তার মাকে বললো– আম্মা! আমি যদি আজ গরীব না হতাম, নাঈমের সাথে তাদের মামার বাড়িতে বেড়াতে যেতে পারতাম। নাঈম আমাকে যেতে বলেছে, আমি রাজি হইনি। শায়েরের মা বললেন– তুমি রাজি হলে না কেন। আমরা গরীব তাতে কী হয়েছে। নাঈম যদি যেতে বলে যাও। শায়ের বললো–না আম্মা যাবো না। নাঈম বড়লোকের ছেলে, আর আমরা গরীব। আমাদের অবস্থার দিকে তাকালে আমার খুব দুঃখ লাগে, তাই আমি নাঈমের সাথে যাবো না। শায়েরের মা বললেন– আমরা গরীব তাতে কী হয়েছে বাবা? আল্লাহ তাআলার কাছে সবাই সমান। বরং গরীবদেরকেই তিনি বেশি ভালবাসেন। আমাদের নবীজীও গরীব ছিলেন। আমরা গরীব তাতে কোনো দুঃখ নেই। দুঃখ করা ভাল নয়। তুমি নাঈমের সাথে যেতে চাইলে যাও।

শায়ের মায়ের মুখের কথা শুনে সবাই মিলে খেয়েদেয়ে নাঈমের সাথে তাদের মামার বাড়ির দিকে রওনা করলো। ❐

গোমতীর পাড়ে কারবালা

মুহাররম মাস। পড়ন্ত বিকেল। মাথার উপর মেঘেরা ছোটাছুটি করে দক্ষিণ আকাশে এসে ভিড় জমাচ্ছে। এ যেন বৃষ্টি নামার আগমনী বার্তা। সারাদিন সূর্যের চেহারা দেখা যায়নি। দিনটি কেমন যেন গুমরে ছিল। একটু আগে চারদিকের মসজিদগুলোতে আছরের আজান হয়ে থেমে গেছে। শাব্বীর ও মাসুদ জামাতে নামায আদায় করে টাউন হল মাঠের সবুজ ঘাসের গালিচায় এসে বসলো। সবুজ প্রাঙ্গণজুড়ে আরো অনেকেই বসে রসে, কেউবা পায়চারি করে বিকেল কাটাচ্ছে। প্রাঙ্গণের কোথাও আবার অনেক লোক জড়ো হয়ে ক্যাম্পাসারের কথা শুনছে। তবে অন্যদিনের মতো লোকজনের তেমন ভিড়াভিড়ি নেই। রিকশার সংখ্যাও একটু কম। সব মিলিয়ে শহরের অবস্থা মোটামুটি শান্ত।

শাব্বীর ও মাসুদ বাদামওয়ালার 'বা-দা-ম' ডাক শুনে কিছু বাদাম নিল। দু'আঙ্গুলে টিপে টিপে বাদাম খেতে খেতে তাদের পরীক্ষা নিয়ে আলাপ করছে। সামনে তাদের এসএসসি পরীক্ষা। শাব্বীর ও মাসুদ এক সাথে লেখাপড়া করে। তাদের দু'জনের বাসাই শহরে।

হঠাৎ শাব্বীরের কানে ভেসে এলো একটি ভিন্নরকম মাইকিং এর আওয়াজ। এ আওয়াজ শুনে শাব্বীর মাসুদকে লক্ষ্য করে বললো– কিরে তুই তো দিব্যি বাদাম খেয়েই যাচ্ছিস, মাইকে একি বলছে তুই কিছু শুনছিস?

মাসুদ : শুনবো না কেন, অবশ্যই শুনছি। আর শুনারইবা প্রয়োজন কিসের? এটা নতুন কোনো বিষয় নাকি। তুই তো বোধ হয় কিছুই জানিস না, প্রতি বছর মুহাররম মাস এলেই তো এমনটি হয়ে থাকে!

শাব্বীর : মানে! কী হয়ে থাকে, তোর কথাতো আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি তো কিছুই জানি না। একটু খুলে বল না!

মাসুদ : কিছুই জানিস না। তুই দুনিয়াতে আজই আসলি নাকি? তবে শোন! প্রতি বছর দশই মুহাররম এলেই এমনটি হয়ে থাকে। সেদিন 'হায় হোসাইন, হায় হোসাইন' এর সম্মিলিত আওয়াজে সমগ্র শহর উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ঢাক-ঢোল, সানাই ইত্যাদি বাজনা নিয়ে, ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে মিছিলসহ সমগ্র শহর প্রদক্ষিণ করা হয়। সে মিছিলে বাদ্যের তালে তালে বিভিন্ন প্রকার নাচ, গান ও অভিনয় করা হয় এবং বিভিন্ন জনকে হোসাইন, ইয়াজিদ প্রমুখ চরিত্রে সাজানো হয়। আরো অনেক কিছু। শহর প্রদক্ষিণ শেষে গোধূলীর পূর্বমুহূর্তে কাফেলাটি প্রস্থান করে কারবালা প্রান্তরে। সেখানে হোসাইনবাহিনী ও ইয়াজিদবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ-খেলা সংঘটিত হয়। আমি গত বছর কাফেলাটিতে ছিলাম, দারুণ মজা হয়েছিল। এবারও .....

শাব্বীর মাসুদকে থামিয়ে দিয়ে ভ্রু কুঁচকিয়ে বললো–তা তো দেখছি অত্যন্ত গর্হিত ও নাজায়িয কাজ হয়ে আসছে? এগুলো তো শিয়ারা করে থাকে। আচ্ছা! তুই যে কারবালা প্রান্তরের কথা বললি, তার মানে কী? তারা কোথায় যায়? কোথায় সেই কারবালা প্রান্তর?

মাসুদ : তুই তাও চিনিস না? এই তো চকবাজারের সাথে গোমতী নদীর পাড়ঘেঁষে। সেখানে একটি বিশাল মাঠ রয়েছে, সেটাই কারবালা প্রান্তর। তুই এবার আমার সাথে যাস, তাহলে দেখে আসতে পারবি।

শাব্বীরের আব্বা আবদুর রশীদ ভূঁইয়া একজন দীনদার ও আল্লাহভীরু লোক। এলাকার লোকেরা তাঁকে খুব মান্য করে।

তিন যেভাবে চলেন, তাঁর ছেলে-মেয়েদেরকেও সেভাবে চালাতে চেষ্টা করেন। শাব্বীর নিজেও কুরআন-হাদীস ও বিভিন্ন ইসলামী বই বাসায় রেখে পড়ে।

মাসুদের মুখের কথা শুনে শাব্বীর বললো–মাসুদ, তোর কথা শুনে আমার হাসিও পাচ্ছে সাথে সাথে দুঃখও লাগছে। কোথায় শত শত বছর আগে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নয়নের মণি ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্মান্তিক শাহাদাত বরণের ঘটনাটি ঘটেছে ইরাকের ফুরাত নদীর তীরে কারবালা নামক প্রান্তরে, আর এখন এক নতুন কারবালার জন্ম হয়েছে গোমতী নদীর তীরে। আর তুই যা বললি, এই মহান দিনটির করণীয় কি এটা-ই?

মাসুদ : তুই কী বলতে চাস?

শাব্বীর : এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটিতে এমন হবে কেন? সে দিনটিতো খুবই ফজীলতময়। দিনটির নির্দিষ্ট ইবাদত রয়েছে। সেদিন রোযা রাখলে অনেক ছাওয়াব পাওয়া যায়। আর তুই যে কথাগুলো বললি সেগুলো তো মর্সিয়া ক্রন্দন, মর্সিয়া ক্রন্দনের কথাতো কুরআন-হাদীসে নেই।

মাসুদ : তবে কি আমি ভুল ও ভ্রান্ত পথে আছি, একাজ কি গর্হিত?

শাব্বীর মাসুদের প্রশ্নের জবাব দেবে এমন সময় তাদের সহপাঠী জাহিদ এসে বললো–কিরে তোরা কেমন আছিস, তোরা কী নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছিস?

শাব্বীর : মুসলমানের ছেলে হিসেবে কুশলাদি জিজ্ঞেস করার আগে তোর সালাম দেওয়া প্রয়োজন ছিল। নবীজীর হাদীসে আছে–কথা বলার আগে সালাম দিতে হয়।

জাহিদ : তুইতো দেখছি আজকাল মৌলভী বনে গেছিস।

শাব্বীর : মৌলভী হতে পারলে তো আমার সৌভাগ্যই হতো। মৌলভী হওয়া কি চাট্টিখানি কথা? মৌলভীগণ নবী-রাসূলদের উত্তরসুরী।

জাহিদ : হয়েছে ভাই আর ওয়াজ করতে হবে না। এতক্ষণ তোদের মধ্যে কী নিয়ে কথা হচ্ছিল তা-ই বল।

শাব্বীর : ও হ্যাঁ, কথা হচ্ছিল দশই মুহাররম নিয়ে। তুই যখন এসেছিস শোন। দশই মুহাররম মানে আশূরার দিনটি মর্সিয়া ক্রন্দন আর তবলা-বীনার তালে তালে কাটিয়ে দেওয়া খুবই মন্দ ও গর্হিত কাজ।

জাহিদ : হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের এলাকার মসজিদের ইমাম মুফতী আলী হায়দার সাহেবও গত জুমায় বলেছেন এমনটি করা নাকি বিদআত এবং জঘন্য অপরাধ।

শাব্বীর : উনার দেশ কোথায়? ইমাম সাহেব আর কী করেন?

জাহিদ : দেশ কোথায় তা জানি না, তবে এতটুকু জানি উনি কাসেমুল উলূম মাদরাসার শিক্ষক।

শাব্বীর : উনার কথা আমিও শুনেছি, উনি নাকি খুব ভাল আলেম। আচ্ছা যাক, কিরে মাসুদ ঘুমুচ্ছিস নাকি। কোনো কথা বলছিস না যে?

মাসুদ : আরে যা সবই শুনছি, বল।

শাব্বীর : শুধু কারবালার ঘটনা নয়, পৃথিবীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এ দিনে সংঘটিত হয়েছে। অনেক নবী-রাসূলের জীবনের স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা আশূরার দিনে সংঘটিত হয়েছে বলে জানা যায়। বিশেষ করে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর নিরাপদে সমুদ্র পার হওয়ার ঘটনা এবং ফিরআউনের সৈন্য-সামন্তসহ ডুবে মরার ঘটনা এ দিনে সংঘটিত হয়েছিল।

বনী ইসরাইলের মুক্তিদিবস হিসেবে এ দিনটি তৎকালীন ইয়াহুদীরা পালন করতো। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় গিয়ে বিষয়টি খেয়াল করেন। তখন তিনি ইরশাদ করলেন–"আমার পূর্ববর্তী নবী মুসা আলাইহিস সালাম-এর এ নাজাত ও বিজয়ে আনন্দ ও শুকরিয়া আদায় করার তো আমি বেশি হকদার। সুতরাং ইয়াহুদী সম্প্রদায় এ দিন রোযা রাখে, আমরা মুসলমানরাও রোযা রাখবো। তবে ওদের সাথে সাদৃশ্য না হওয়ার জন্য আমরা রোযা রাখবো দশই মুহাররমের দিন এবং এর আগে বা পরে একদিন মিলিয়ে মোট দুই দিন।

পবিত্র রমজানের রোযা ফরজ হওয়ার আগ পর্যন্ত মুসলমানরা আশূরার রোযা জরুরী রোযা হিসেবেই রাখতেন। কিন্তু রমজানের রোযা ফরজ হওয়ার পর থেকে এটি নফল রোযা হিসেবে পরিগণিত হয়। অবশ্য হাদীস শরীফে এসেছে যে, রমজানের রোযার পর আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন রোযা হচ্ছে আশূরার রোযা।

হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আহলে বাইতের সদস্য, তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় দৌহিত্র সাহাবী হযরত হোসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজীর ওফাতের ৫০ বছর পর ৬১ হিজরীতে ইরাকের কারবালা প্রান্তরে নিজ পরিবার ও সঙ্গী-সাথীসহ এ দিনেই শাহাদাত বরণ করেন। তৎকালীন শাসকের সাথে আদর্শিক বিরোধ ও নৈতিক সংঘাতের ফলে এক হৃদয়বিদারক নৃশংসতার শিকার হন তিনি। ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম ভারাক্রান্ত অধ্যায় এটি।

কারবালার ঘটনা যদিও আশূরার গুরুত্ব বা তাৎপর্যের মূখ্য কারণ নয়, তবে আশূরার ধর্মীয় তাৎপর্যের মতোই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধারার এমন করুণ আর শোকাবহ ঘটনা মুসলিম উম্মাহর মনে এমনভাবে রেখাপাত করে আছে যা কখনো মুছে যাওয়ার মতো নয়। আর এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, হোসাইনী আদর্শের সাথে শিয়া সম্প্রদায়ের চিন্তা-ভাবনা বা কার্যকলাপের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। এ দিনকে উপলক্ষ করে তাদের তাজিয়া মাতম নিতান্তই গর্হিত কাজ।

মুহাররম মাসের ফজীলত ও এর ইতিহাস-ঐতিহ্য একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। কিন্তু এতে গল্পরসিকদের বানোয়াট কিসসা কাহিনী এবং রসম পূজারীদের নানান গর্হিত রসম-রেওয়াজেরও কমতি নেই। দুঃখজনক ব্যাপার যে, আজকে দেখছি শিয়াদের অনুসরণ করে কোনো কোনো মুসলমানও অজ্ঞতাবশতঃ এ দিনে বিভিন্ন গর্হিত ও শিরকী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাতি বিশিষ্ট সাহাবী সাইয়্যিদুনা হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতকে ভিত্তি করে ইসলামী শিক্ষা, নবীজীর সুন্নাত ও আহলে বাইতের পথনির্দেশনা পরিহার করে শিয়ারা এ দিন শোক-মাতমের জুলুস বের করে বিভিন্ন মনগড়া হারাম কাজে লিপ্ত হয়, এমনকি

এর সাথে তাজিয়ার মতো শিরকী কাজ পর্যন্ত তারা সংযোজন করে থাকে। আফসোসের কথা হল, এসবই আবার আহলে বাইতের মুহাব্বতের অজুহাতে করা হয়; অথচ এসবকিছুই আহলে বাইতের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

তাই প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হলো–যে নববী শিক্ষার উপর সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইত অটল ছিলেন, সে শিক্ষা অবলম্বন করা। মাতম, শোক পালন, জামার বুক ছিঁড়ে, নিজের গালে চপেটাঘাত করে অধৈর্য প্রকাশ ইত্যাদি মাতম-জুলুস করা সম্পূর্ণ নাজায়িয কাজ। হাদীস শরীফে সুস্পষ্ট ভাষায় এগুলো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আশূরার দিন ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কারবালা প্রান্তরে শহীদ হয়ে গেলেন। পৃথিবীর রক্তিম সূর্য ডুবে গেল। কারবালার সেই করুণ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদেরকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে উজ্জীবিত হতে হবে। বীর মুজাহিদ ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু জালিমদের সাথে আপোস না করে বীরবিক্রমে জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করেছেন। তাথেকে আমাদেরকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিরউন্নত শির হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ কতে হবে। কারবালার শিক্ষা গোমতী নদীর তীরে নিউ কারবালা প্রান্তর সাজানো নয়। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার 'মুহররম' কবিতায় বলেছেন–

'ফিরে এলো আজ সেই মুহররম মাহিনা
ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না।'

শাব্বীরের মুখের মর্মছোঁয়া আলোচনা শুনে মাসুদ ও জাহিদ শাব্বীরের হাতে হাত রেখ বললো–'আর এমন হবে না, এখন থেকে সঠিক ও শুদ্ধ পথে চলবো।'

কথায় কথায় বিকালটি কেটে গেল। মানুষের জীবনের সময়গুলোও কেটে যাবে এভাবে। এক সময় মিনার চুড়ে ভেসে এলো পবিত্র মাগরিবের আজান। ওরা তিনজন মসজিদের দিকে হাঁটতে লাগলো। ❐

দুনিয়ার আজাব

এক.

কুরবানপুরের ছেলে সুলতান। সবাই তাকে সুলতু বলে ডাকে। তার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তার বাবা মারা যান। সে মা-বাবার একমাত্র সন্তান। তার বাবা মারা যাওয়ার পর তার মা আর বিয়ে বসেননি।

তার বাবা আলিমুদ্দীন মারা যাওয়ার সময় পনের শতক জমি রেখে গেছেন। সে জমিটুকু এখন মিদ্দার বাড়ির আজাদ মিদ্দা ভাগে করে। সে জমি থেকে যে ফসল আসে, তা দিয়েই সুলতুর মা ছেলেকে নিয়ে সংসার চালায় আর সুলতুর লেখাপড়ার খরচ বহন করেন। সুলতু লেখাপড়ায় মোটামুটি ভাল। সে এবার এইচ.এস.সি পরীক্ষা দিয়েছে।

সুলতুর বড় চাচা হাছনুদ্দীন মেম্বার একজন মন্দ স্বভাবের লোক। গত দু'বছর ধরেই তিনি সুলতুকে দেশের বাইরে পাঠানোর জন্য তার মাকে পরামর্শ দিয়ে আসছেন। সুলতুর মা সহজ সরল মানুষ, তার উপর তার স্বামী নেই, ভাশুরের কথা না শুনলেও শুনতে হয়। তাই ভাশুরের কথায় সুলতুকে মালয়েশিয়া পাঠিয়ে দিলেন। বিদেশ পাঠানোর মতো অর্থ তার হাতে ছিল না। আর ভাশুর হাছন মেম্বার যে দুয়েক পয়সা দিয়ে চালাবেন তেমন মানুষ তিনি নন। তিনি বড় কঠিন মানুষ। সুলতুর মা'র যে জমিটুকু ছিল সেটুকু বিক্রি করেই অর্থের যোগাড় করতে হলো।

দুই.

সুলতুর মালয়েশিয়া জীবনের এক বছর কেটে গেল। এক বছরে চিঠি সহ অনেক টাকা-পয়সা, মাল-মাত্তা পাঠিয়েছে। হাছন মেম্বারই সুলতুদের অভিভাবক। তিনি একজন নামী দামী লোকও। তাই এ সবগুলোই সে তার চাচা বরাবর পাঠিয়েছিল। নামী দামী হলে কি হবে, তিনি একজন নির্দয় ও পাষাণ হৃদয়ের লোক। সুলতুর প্রেরিত সব মাল-সামানই তিনি ভোগ করলেন। একটা কানা পয়সাও তিনি সুলতুর মাকে দেননি। সুলতু দেশের বাইরে আসার এক মাসের মাথায় যে চিঠিটি পাঠিয়েছিল, শুধু সেটিই তার হাতে পৌঁছেছিল। আদুরে ছেলের চিঠি পেয়ে তার মা'র অশান্ত মন শান্ত হয়েছিল।

ঐ জমিটুকুই ছিল সুলতুর মা'র সম্বল, তাও হাতছাড়া হয়ে গেল। এখন তার হাতে কানা কড়িটাও নেই। এখন সুলতুর মাকে ভিখ মেগে দিন কাটাতে হচ্ছে। অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে হচ্ছে। অপর দিকে সুলতুর কোন খোঁজখবর পাচ্ছে না। হাছন মেম্বার তার হাতে সুলতুর প্রেরিত কোনো পত্রই পৌঁছায় না। সুলতুর মা নিজেও লিখতে পারে না। ছেলের চিন্তায় তার জীবন দুঃসহ হয়ে উঠলো। ছেলেকে এক নজর দেখার জন্য তার পাঁচরূহ পড়ে রয়েছে। তার মনকে সে সান্ত্বনা দিতে না পেরে ভাশুরের কাছে সুলতুর খবর জানতে চায়–'ভাই সাব! আমার সুলতুর কোনো খোঁজখবর আছে নি? সুলতু কোনো জিনিস পাডাইছে নি? কোনো চিডি আইছে নি? সুলতু যানি গেছে আজগা তিন বছরে পারা দিছে, তার দো কোনো খোঁজখবর পাইতাছি না ভাই সাব!'

সুলতুর মা হাছন মেম্বারকে অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে এ কথাগুলো। তার কথার সাথে তার কলিজাটা বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম। কিন্তু তার পরেও হাছন মেম্বারের মন গলে না। তিনি অত্যন্ত চড়া গলায় সুলতুর মা'র কথার জবাব দিয়ে দেন–'না, তোমার সুলতুর কোন খবর-টবর নাই! সে কোনো কিছু পাঠায় নাই। কোনো চিঠি আসে নাই। আমরা অনেক চিঠি পাঠিয়েছি, তোমার ছেলে কোনো উত্তর-টুত্তর দেয় না। যাও তুমি এখান থেকে। তোমার সাথে আমার রসের আলাপ করার সময় নাই।'

ভাশুরের এ কথায় সুলতুর মা বুকভরা দুঃখ নিয়ে লজ্জিত হয়ে ফিরে আসে।

তিন.

সুলতু বিদেশ গেছে পাঁচ বছর হলো। এই পাঁচ বছরে সে তার মা'র জন্য যা কিছু পাঠিয়েছে, এর সবগুলোই সুলতুর চাচা আত্মসাৎ করে ভোগ করেছেন। সুলতুর পাঠানো টাকায় নিজের ঘর সাজিয়েছেন, জমিজমা বাড়িয়েছেন, গোয়ালে গরু করেছেন, সোনা-চান্দী জুগিয়েছেন। কিন্তু সুলতুর মা'র দিকে একটু ফিরে পর্যন্ত তাকাননি তিনি।

হাছন মেম্বার এমনিই মানুষের টাকা-পয়সা লুটেপুটে নিজের ধন-সম্পদ বাড়িয়েছেন। টাকা-পয়সা, সোনা-দানার অভাব নেই তার। কিন্তু এত্তো কিছুর পরেও তার মনে শান্তি নেই। তার সাথে একটির পর একটি টেনশন লেগেই আছে।

গত বছর অনাবৃষ্টিতে তার প্রচুর ফসল নষ্ট হয়েছিল। এ বছর বৈশাখ মাস থেকেই প্রবল বেগে বৃষ্টি হচ্ছে। পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে প্রবল স্রোতে পানি ঢুকছে। ফলে এক ভয়ানক জলপ্লাবনের সৃষ্টি হলো। এ বন্যা ও প্লাবনের কেবলই অবনতি। উন্নতির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এ বিনাশী বন্যায় সারাদেশ ভেসে গেছে। আর এ বানে হাছন মেম্বারেরও অনেক ক্ষতি হয়েছে। সবাই এ ভয়াবহ বন্যাকে আল্লাহ তাআলার আজাব মনে করছে। কিন্তু হাছন মেম্বার সেটিকে আজাব মনে করেন না। তিনি বলেন, প্রকৃতির খেয়ালীপনায় তার এমন দশা হয়েছে।

বন্যায় তার জমিনের প্রচুর ফসল নষ্ট হয়েছে। পুকুরের মাছ ভেসে গেছে। ঘরের ভেতর দু'হাত পর্যন্ত পানি ফুলে উঠেছে। এ বিষাক্ত বানের পানিতে ছেলেপেলে নিয়ে দিন কাটানো তার পক্ষে দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। তার মাইনুদ্দীন নামের ছোট ছেলেটি দু'সপ্তাহ ধরে ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত। খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। গোয়ালের গরুগুলো পর্যন্ত খাদ্যের অভাবে ছটফট করে মরছে। গত রাতে তার চৌদ্দ বছরের মেয়ে শেফালী সাপের দংশনে মারা গেছে। চারদিকে তার শুধু বিপদ আর বিপদ।

হাছন মেম্বার এতদিনে বুঝতে পেরেছেন যে, এ বন্যা তার জন্য আল্লাহ তাআলার আজাব ও গজব হিসেবে নাযিল হয়েছে। তাকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হচ্ছে। তার জালিয়াতির জন্য তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করেন।

বন্যারূপী এ আজাব দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্থায়িত্ব হলো। এ আজাবে হাছন মেম্বারের সবকিছুই নিঃশেষ হয়ে গেছে। ফলে তিনি বিলকুল সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েন। শুধু হাছন মেম্বার নয়, তার মতো শত শত হাছন মেম্বারের এমন দশা হয়েছে। কথায় আছে 'একজনের পাপে দশজন ফাঁপে।' আর সুলতুর মা'র এমনিতেই কিছু ছিল না। সে জানটা নিয়ে কোনো রকমে একটি আশ্রয় কেন্দ্রে ঠাঁই নিল। আর এ বন্যায় দেশের রাস্তা-ঘাট, কল-কারখানার যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে, আগামী কয়েক বছরেও তার সম্পূরণ সম্ভব হবে না।

চার.

ছয় বছরের মাথায় সুলতু দেশে ফিরলো। বাড়িতে এসে তার মা ও চাচার পরিবারের এ দৈন্যদশা দেখে তার মাথায় যেন আসমানটা ভেঙে পড়লো। সুলতুর ভাবনা ছিল, তার পাঠানো টাকায় নতুন করে বাড়ি করেছে। আসবাবপত্রে ঘর-দোর সাজিয়েছে। কিন্তু তার ভাবনার পুরো উল্টো হলো। সে তার চাচার জালিয়াতির কথা শুনেও কিছু বলেনি। সুলতু নতুন করে ঘর বেঁধে শাদী করলো এবং মা ও স্ত্রীকে নিয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগলো। ❐

ফিলিস্তিনী মেয়ের ভালবাসা

এক.

জলপাই বাগানে ঘেরা ফিলিস্তিন। সারিবদ্ধ গাছগুলোতে থরে থরে সাজানো জলপাই। দক্ষিণ ফিলিস্তিনের উপকূলীয় শহরে বসবাস করে একটি কৃষক পরিবার। সেই পরিবারে ১৯৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন পরবর্তীকালের হামাস নেতা শায়েখ আহমদ ইয়াসীন। বাবা আদর করে ডাকেন আহমদ, আর মা ডাকেন ইয়াসীন। বাবা-মায়ের আদরে বড় হতে থাকেন তিনি। এরই মধ্যে ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন দখল করে নেয় ইসরাইলীরা। জন্ম নেয় ইয়াহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের। নিরীহ ফিলিস্তিনীদের উপর চালাতে থাকে অমানবিক নির্যাতন। নির্যাতনের দাবদাহ সইতে না পেরে ত্যাগ করে আসকালান শহর। আশ্রয় নেয় বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে।

হাজার হাজার ফিলিস্তিনী পরিবারের মতো শায়েখ আহমদ ইয়াসীনের পরিবারও উৎখাত হয় নিজ বাসস্থান থেকে। তারা আশ্রয় নেয় গাজার আলশাতি শরণার্থী শিবিরে। বাবা-মা, ভাই-বোনের সাথে কাটতে থাকে শরণার্থী জীবন। বড় হয়ে উঠতে থাকেন শরণার্থী শিবিরে। শায়েখ ইয়াসীনের বাবা তাকে ভর্তি করিয়ে দেন শিবিরের একটি ভাল স্কুলে। তিনি লেখাপড়া করতে থাকেন সেখানে।

বার বছর বয়সে কোনো এক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হন আহমদ ইয়াসীন। আঘাত পান মেরুদণ্ডে । পায়ের নিচের দিকে অবশ হয়ে

যায় তার। তিনি আর পা ফেলে হাঁটতে পারেন না। শুরু হয় এক ব্যতিক্রম জীবন। হুইল চেয়ারে চলাফেরা করতে থাকেন তিনি। এ অবস্থাতেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন আহমদ ইয়াসীন। অর্জন করতে থাকেন উচ্চ শিক্ষা। তখনই স্পষ্ট হয়ে উঠে তার মতাদর্শ। তিনি বিশ্বাস করেন–কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য ফিলিস্তিন হবে একটি ইসলামী ভূখণ্ড । কোনো আরব নেতারই এই ভূখণ্ডের অংশবিশেষ পরিত্যাগ করার অধিকার নেই।

মিশরে থাকাকালীন 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' নামক সংগঠনের সংস্পর্শে আসেন তিনি। ফিলিস্তিনে গঠন করেন তার একটি শাখা। তিনি মিশরের কায়রোয় আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে ফিরে আসেন গাজায়। তখন ছিল ১৯৭০ সাল। ফিরে এসে গঠন করেন 'মুজামা আল-ইসলামী' নামক একটি সংগঠন। একটি নতুন আন্দোলন।

শারীরিকভাবে দুর্বল হলেও মানসিক ভাবে তিনি খুবই দৃঢ়চেতা। ইসরাইলের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না তিনি। সব সময়ই সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে ইসরাইলের দখল থেকে পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখেন মাতৃভূমি ফিলিস্তিন। এ লক্ষ্যে গঠন করেন 'আত্মঘাতী স্কোয়াড'। তার অনুপ্রেরণায় ফিলিস্তিনী আত্মঘাতী স্কোয়াডগুলো হামলা চালিয়ে অস্থির করে রাখে ইসরাইলকে।

১৯৭৯ সাল। ইরানে ইসলামী বিপ্লবের সফলতায় অনুপ্রাণিত হন তিনি। এ প্রেরণা থেকে গঠন করেন 'মজদ ইল মুজাহিদীন'। ১৯৮৪ সালে অবৈধ অস্ত্র ও বিস্ফোরক রাখার দায়ে গ্রেফতার হন তিনি। মুক্তিও পেয়ে যান পরে। মুক্তি পেয়ে আত্মনিয়োগ করেন ইসলামী দল গঠনে। যেন কারাগারের শাস্তির আগুনে জ্বলে জ্বলে এখন ঈমানী শক্তিতে জ্বলে উঠেছেন তিনি। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৮৭ সালের ১৪ ডিসেম্বর আত্মপ্রকাশ করে ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন 'হামাস'।

হামাস মানে উদ্দীপনা। আগ্রাহ-উদ্দীপনার সাথেই সর্বস্তরের বিক্ষুব্ধ জনতা শামিল হতে থাকে এ আন্দোলনে। হাজার হাজার যুবক-তরুণও শামিল হয় হামাসে। টগবগে তরুণ যুহাইরও শামিল হয় এ আন্দোলনে।

মনে-প্রাণে সহযোগিতা করতে থাকে আহমদ ইয়াসীনের। বাবার আহমদ, মায়ের ইয়াসীন হামাসের প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যতম নেতা শায়েখ আহমদ ইয়াসীনে পরিণত হয়েছেন এখন।

দুই.

গাজার কাছাকাছি অন্য একটি শরণার্থী শিবিরে যুহাইরদের বাসা। মা-বাবা ও এক বোন নিয়ে কোনো রকমে দিন কাটায় সেখানে। হামাস আন্দোলনের কাজ শেষে ফিরে যাচ্ছে বাসায়। বেলা ডুবে গেছে তখন। চারপাশের মসজিদ থেকে ভেসে আসছে সালাতুল মাগরিবের আজান। নিকটবর্তী একটি মসজিদে পড়ে নিল নামায। নামাযান্তে রওনা করলো মাথা গোজার ঠাঁই শিবিরের দিকে।

রাস্তা ফাঁকা। মানুষের তেমন আনাগোনা নেই। পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো যুহাইর। রাস্তার পাশে অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে একটি ফিলিস্তিনী মেয়ে। বয়স সাত/আট হবে। এগিয়ে গেল যুহাইর। কয়েক স্থানে তরমুজের মতো ফেটে আছে মেয়েটার মাথা। দরদর করে রক্ত বেরুচ্ছে এখনও। তিতেপোড়া হয়ে গেছে সুন্দর কচি বদনটা। যুহাইর দেরি না করে পাজাকোলা করে নিয়ে গেল নিকটবর্তী চিকিৎসাকেন্দ্রে। ট্রিটমেন করলেন কর্তব্যরত ডাক্তার। তিনি জানালেন–'প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে মেয়েটার। সামান্য রক্ত হলে ইনশাআল্লাহ সেরে উঠবে। রক্তের গ্রুপ 'ও' পজেটিভ।'

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো যুহাইর। আল্লাহ তাআলার অপার কুদরতে মিলে গেল তার রক্তের গ্রুপ। তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিল এক পাউন্ড রক্ত। এরই মধ্যে সংবাদ পাঠালো যুহাইরদের বাসায়। সংবাদ পেয়ে যুহাইরের মা ও বোন নাবীলা ছুটে এলো চিকিৎসাকেন্দ্রে। তার মা সুমাইয়া আফরীন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আহত মেয়েটার সেবায়। ডাক্তারের চিকিৎসা, যুহাইর, তার মা এবং নার্সদের সেবা পেয়ে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলো মেয়েটা। ডাক্তারের নির্দেশে তাকে বাসায় নিয়ে এলো যুহাইর।

এখন কথা বলতে পারে মেয়েটা। যুহাইর নাম জিজ্ঞেস করলো তার। মেয়েটা বললো–তোহফা।

যুহাইর : তোমরা থাকো কোথায়?

তোহফা : খান ইউনিস শরণার্থী শিবিরে।

তোহফা বয়সে ছোট হলেও গুছিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারে সে। যুহাইর আরো জিজ্ঞেস করলো–তুমি এখানে কীভাবে এলে বলতে পারবে? তোহফা বললো–'ইসরাইলীরা আমার বাবা ও ভাইয়াকে মেরে ফেলেছে। মাইশার বাবা ও ভাইয়াকেও মেরে ফেলেছে। তারা আমাদের সবার বাড়ি, বাড়িতে যাওয়ার রাস্তা গুড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের ঘরের কুরআন শরীফগুলো ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে। ভাইয়ার আরবী কিতাবগুলোও ফেলে দিয়েছে। আমার আমপারাটাও ছিঁড়ে ফেলেছে। সেটা আমি পড়তাম। আমাদের স্কুলটা ভেঙে দিয়েছে। মসজিদে প্রস্রাব-পায়খানা করে ভরিয়ে দিয়েছে।'

এ কথাগুলো বলতে বলতে সে হাঁপিয়ে উঠলো। সে একটা ঢোক গিলে আবার বলতে লাগলো–'তারপর তারা আমাকে, আমার আম্মুকে, আপুকে, মাইশার আম্মু ও খালামণিকে এবং আরো অনেক মেয়েকে একটা ট্রাকে তুলে নিয়ে আসে। কতদূর এসে একজন ইসরাইলী চলন্ত ট্রাক থেকে আমাকে ফেলে দেয়, তখন আমি শুধু 'আম্মু' বলে একটা চিৎকার মেরেছিলাম। তারপর আমি আর কিছু বলতে পারবো না....' বলে কান্না শুরু করে দেয় তোহফা। যুহাইর তার কান্না থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো–'পরে মাইশার কী হলো, সে এখন কোথায়?' তোহফা বললো–'মাইশা আর আমি একসাথে স্কুলে যেতাম, একসাথে খেলতাম। সে আমার চেয়ে সামান্য ছোট। ইসরাইলীরা আমাদেরকে ট্রাকে তোলার সময় একজন ইসরাইলী মাইশার এক পায়ে পারা দিয়ে আরেক পায়ে ধরে টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে তাকে। এতক্ষণে মাইশা হয়তো মরে.....।' কথা শেষ না করতেই আবার কাঁদতে শুরু করে সে। সুমাইয়া আফরীন তার কান্না থামিয়ে খাওয়াতে নিয়ে যায় তাকে।

তিন.

হামাস গঠন করায় জ্বালা-পালা শুরু করে দেয় ইসরাইলীদের নাপাক বদন। চরম বিরোধিতা শুরু করে শায়েখ ইয়াসীনের। ইয়াহুদী ইসরাইলের চক্ষুশূলে পরিণত হন তিনি। তখন ছিল ১৯৮৯ সাল। তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় ইসরাইলী সামরিক আদালত। তবে ১৯৯৭ সালে মুক্তি পেয়ে যান তিনি।

জর্দানে দু'জন ইসরাইলী গোয়েন্দা হামাসের আম্মান শাখার রাজনৈতিক প্রধান খালেদ মেশালকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। এ দু'জন গোয়েন্দা ধরা পড়ায় বেকায়দায় পড়ে যায় ইসরাইল। এ পরিস্থিতিতে মধ্যস্থতা করেন জর্দানের বাদশাহ হোসাইন। মধ্যস্থতা মুতাবিক সিদ্ধান্ত হয় যে, জর্দানের হাতে আটক দু'জন গোয়েন্দার মুক্তির বিনিময়ে ইসরাইল মুক্তি দেবে শায়েখ ইয়াসীনকে। জেলে থাকাবস্থায় ফিলিস্তিনী জনগণের কাছে একজন আপোসহীন নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন তিনি।

ফিলিস্তিনী রাজনীতিতে যে দু'টি প্রধান ধারা বহমান, তার একটি ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বাধীন পিএলও, আরেকটি শায়েখ আহমদ ইয়াসীনের হামাস। এ দু'টি দলই ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য জিহাদ করছে। তবে উভয় দলের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। পিএলও ধর্ম নিরপেক্ষ আর হামাস ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। হামাসের লক্ষ্য স্রেফ ইসরাইলের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন নয়, বরং পাশাপাশি ফিলিস্তিনকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা। ১৯৯৩ সালে স্বাক্ষরিত পিএলও–ইসরাইল শান্তিচুক্তিকে স্বীকার করে না হামাস। তবুও শায়েখ ইয়াসীন প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন না ইয়াসির আরাফাতের। তিনি জানেন–নেতৃত্বের মধ্যে প্রকাশ্যে বিবাদ দেখা দিলে দুর্বল হয়ে পড়বে ইসরাইলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের চলমান জিহাদ। ক্ষুণ্ন হবে ফিলিস্তিনীদের স্বার্থ। তবুও তিনি তার আদর্শে অবিচল। যুহাইরও কাছে থেকে থেকে একজন নিবেদিত প্রাণ কর্মীতে পরিণত হয় শায়েখ ইয়াসীনের।

চার.

যুহাইরের বাবা-মায়ের আদর সোহাগ পেয়ে বড় হতে থাকে তোহফা। যুহাইরও খুব আদর করে তাকে। বোনের মতোই ভালবাসে যুহাইর। নাবীলাও খুব খুশি সমবয়সী একটা খেলার সাথী পেয়ে। তোহফা আদর সোহাগ পেয়ে ভুলে থাকে তার মা-বাবার কথা। নাবীলার বাবা-মাকে আব্বু-আম্মু বলে ডাকে সে। তারাও নাবীলার মতো আরেকটা মেয়ে হিসেবে ধরে নিয়েছে তাকে। যুহাইরকে বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করে সে। নাবীলা বয়সে সামান্য বড় হওয়ার দরুণ আপু ডাকে তাকে। তবুও কখনো একা হলে মা-বাবার কথা মনে পড়ে যায় তার। তখন মা-বাবা, আপনজনদের জন্য কাঁদতে থাকে সে। কান্না পেলে নাবীলা এসে হাত ধরে নিয়ে যায় তাকে।

যুহাইর নাবীলার সাথে শরণার্থী শিবিরের ভাল একটা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয় তোহফাকে। সে পড়াশোনা করতে থাকে সেখানে। যুহাইরের বাবা ফুহাইর সাহেব দৃষ্টিশক্তিহীন, চোখে দেখেন না তিনি। ইসরাইলী বুলেটের আঘাতে কেড়ে নিয়েছে তার দৃষ্টিশক্তি। বেশির ভাগ সময় বারান্দার একটা চেয়ারে বসে কাটান তিনি। সেখান থেকেই ডাকেন 'মা তোহফা! তোহফা!' করে। ডাক শুনে নাবীলা তোহফার হাত ধরে নিয়ে আসে তার অন্ধ বাবার কাছে। তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করেন তোহফাকে। আদর পেয়ে অশ্রুসজল হয়ে উঠে তার আঁখিযুগল। আবার মনে পড়ে যায় তার বাবা-মায়ের কথা।

যুহাইর বাসায় ফিরলে নাবীলা ও তোহফা হাত ধরাধরি করে দু'জন দু'পাশে গিয়ে বসে যুহাইরের। যুহাইর তাদেরকে শোনায় শায়েখ আহমদ ইয়াসীনের বীরত্বের কথা। অলৌকিক কারামতের কথা। জিহাদের ময়দানে আল্লাহপ্রদত্ত সাহায্যের কথা। আরো শোনায় ইয়াহুদী ইসরাইলের কথা। এসব শুনে বিস্মিত হয়ে উঠে নাবীলা ও তোহফা। ভয়ে কেঁপে উঠে তাদের কচি হৃদয়। সাথে সাথে ইসলামের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয় তাদের। ঘৃণা সৃষ্টি হয় ইয়াহুদী ইসরাইলের প্রতি।

এসব কথা শোনার জন্য সবসময় উন্মুখ হয়ে থাকে নাবীলা ও তোহফা। যুহাইর কবে বাসায় ফিরবে, চাতক পাখির মতো প্রতীক্ষা করতে থাকে তারা। বাসায় এলেই এসব মধুময় গল্প শোনার জন্য যুহাইরের পাশে বসে পড়ে দু'বোন। যুহাইর আনন্দচিত্তে বলে যায় হামাস নেতা শায়েখ আহমদ ইয়াসীনের বীরত্বের কথা। সাহসিকতার কথা। এসব কথা শুনে শুনে শায়েখ ইয়াসীনের প্রতি আলাদা একটা শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়ে যায় তাদের।

পাঁচ.

২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাস। সূচনা হয় নতুন ইন্তিফাদার। ইসলামপন্থী জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ ফিলিস্তিনী আন্দোলনগুলোকে হামাসের আত্মঘাতী বোমা হামলা কৌশলের সাথে সম্পৃক্ত করেন শায়েখ আহমদ ইয়াসীন। চরম কুরবানীর প্রয়োজন জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনে। তাই আশাহত ফিলিস্তিনীদেরকে নবউদ্যমে ত্যাগের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করেন তিনি। রক্ত ছাড়া কোনো আন্দোলন দেখে না সফলতার মুখ। তাই জাতীয় স্বার্থে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আত্মত্যাগের জযবা সৃষ্টি করেন তিনি। এখন প্রতিটা ফিলিস্তিনীই মনে করেন–শাহাদাত হচ্ছে স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র পথ।

প্রতিরোধ আন্দোলনের পাশাপাশি তিনি স্কুল-কলেজ, ক্লিনিক-হাসপাতালও প্রতিষ্ঠা করেন হামাসের মাধ্যমে। দুঃস্থ অসহায় পরিবারগুলোকে দিতে থাকেন বিনামূল্যে শিক্ষা ও চিকিৎসা। আরো আস্থা অর্জন করে আমজনতার। বিশাল জনসমর্থন নিয়ে বিকশিত হতে থাকে হামাস। কিন্তু তার পেছনে লেগে যায় ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়ে যান তিনি। তবুও তার কর্মকাণ্ড সীমিত রাখার উদ্যোগ নেয় ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষ। গৃহবন্দী করে রাখে শায়েখ ইয়াসীনকে।

তখন ছিল ২০০১ সাল। পুলিশের সাথে বাঁধে তুমুল সংঘর্ষ। একজন নিহত হয় এতে। ২০০১ সাল পেরিয়ে এলো ২০০২ সাল। শায়েখ ইয়াসীনের বাড়ি ঘেরাও করে ফিলিস্তিনী পুলিশ। গোলাগুলি হয় আবার। এভাবে কেটে যায় ২০০২ সাল। আসে ২০০৩ সাল। সেপ্টেম্বরের দিকে

ইসরাইলী সেনাবাহিনী হত্যার চেষ্টা করে শায়েখ ইয়াসীনকে। সফল হতে পারেনি তারা। আল্লাহ তাআলার অপার কুদরতে বেঁচে যান তিনি।

ছয়.

ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠে তোহফা। যৌবনের আলামতগুলো প্রকাশ পায় তার দেহজুড়ে। এখন আর যুহাইরের পাশে বসে শায়েখ আহমদ ইয়াসীনের গল্প শোনে না সে। তবে নাবীলার কাছ থেকে শোনে নেয় সব। তার কামরায় আড়ালে দাঁড়িয়েও শুনে কখনো। নাবীলা সব শুনে যুহাইরের পাশে বসে বসে। তোহফারও মন চায় পাশে গিয়ে বসতে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত বাধা দেয় তাকে। যুহাইর তার গাইরে মাহরাম। বালেগা হওয়ার পর দেখা-সাক্ষাৎ করা জায়িয নয় গাইরে মাহরামদের সাথে। যুহাইরও আর সামনে যায় না তোহফার। তার জন্যও প্রযোজ্য ইসলামের এ পরিচ্ছন্ন বিধান।

তোহফা ফিলিস্তিনী সংবাদপত্রের মাধ্যমেও জেনে নেয় শায়েখ ইয়াসীনের খবরাখবর। হকার এসে পেপার দিয়ে যেতেই সবার আগে লুফে নেয় তা। সর্বপ্রথম পড়ে নেয় শায়েখ ইয়াসীনের খবর। শায়েখের সাফল্যে তৃপ্তিতে ভরে উঠে তার মন। আর এর ব্যতিক্রম কোনো খবরে তার মনও খারাপ হয়ে যায় সাথে সাথে। নামায পড়ে হায়াত দারাজের দোয়া করে শায়েখ ইয়াসীনের। নফল রোযা রাখে তার জন্য।

সাত.

ভাল একটা কবীলায় ঠিক হয়েছে নাবীলার শাদী। তোহফার জন্যও পয়গাম আসতে থাকে নামী-দামী কবীলা থেকে। একদিন যুহাইরের মা সুমাইয়া আফরীন যুহাইরকে বললেন–'বাবা যুহাইর! বয়সতো আমাদের কম হয়নি, হায়াত-মওতের কথা বলা যায় না, তোর বাবা অসুস্থ, আমরা কি তোর বউ দেখে যেতে পারবো না?' যুহাইর বললো–'আম্মাজান! ভাল মনে করলে আপনারা পছন্দ করুন। আপনাদের পছন্দের অমত করবো না।' সুমাইয়া আফরীন একটু ইতস্তত করে বললেন–'আমরা চাচ্ছিলাম কি–অন্য

কবীলায় দেওয়ার কি প্রয়োজন। মেয়েটা তো কোনোদিক দিয়ে ফেলনা নয়। তোহ.....' যুহাইর তার মায়ের কথা থামিয়ে দিয়ে বললো–'আর বলতে হবে না মা! নাবীলার শাদীটা হয়ে যাক। আর সামনে আমার একটা অপারেশন আছে, সেটা সাকসেস হওয়ার পরই না হয় ভাবুন।' এই বলে যুহাইর সেখান থেকে প্রস্থান করে।

আড়াল থেকে মা ও ভাইয়ের কথাগুলো শুনছিল নাবীলা। তাদের কথা শেষ হতেই সে ছুটে যায় তোহফার কাছে। গিয়ে দেখে সে মন খারাপ করে বসে আছে। মা-বাবার কথা মনে পড়েছে তার। নাবীলা তোহফাকে লক্ষ্য করে বললো–'কি হবু ভাবী! মন খারাপ করে বসে আছেন কেন?' কথাটা শুনে নাবীলাকে ভেংচি কাটে তোহফা। 'ভেংচি নয় সত্যিই' বলে সেখান থেকে এক দৌড়ে চলে আসে নাবীলা।

মুখে মুখে ভেংচি কাটলেও একটা আনন্দের ফোয়ারা বয়ে যায় তোহফার দেহমনে। সে ভাবে–কথাটা যদি সত্যি হয়ে থাকে খোশনসীব তার। সেও আল্লাহর দরবারে কামনা করছিল দীনের জন্য একজন নিবেদিতপ্রাণ সুপুরুষ। যুহাইরের মতো একজন জানবাজ মর্দে মুজাহিদ জীবন সাথী। যুহাইরও দূর থেকে পছন্দ করে আসছে তোহফাকে। জীবন সাথী হিসেবে পেতে চায় তাকে। তার উপর মা সুমাইয়া আফরীনের প্রস্তাব শুনে আনন্দের সাড়া পড়ে তার হৃদয়তন্ত্রীতে।

আট.

২০০৪ সালের ২২ মার্চ। সোমবার ভোর সাড়ে পাঁচটা। নিজ বাড়ির পাশের একটি মসজিদে ফজরের নামায পড়ে সবেমাত্র বেরিয়ে এসেছেন শায়েখ আহমদ ইয়াসীন। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন তাঁর দেহরক্ষীগণ। হুইল চেয়ারে চেপে বসছেন তিনি। এমন সময় হেলিকপ্টার গানশীপ থেকে তিনটি ক্ষেপনাস্ত্র হামলা চালায় ইসরাইল। তৎক্ষণাৎ ভয়ংকর দৃশ্যের অবতারণা ঘটে সেখানে। ক্ষেপনাস্ত্রের বিস্ফোরিত অংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রাস্তায়, ফুটপাতে। বাড়ির দেয়ালে গিয়ে ঠেকে ছেঁড়া-ছেঁড়া গোশতের

টুকরা। শায়েখ ইয়াসীন যে মসজিদে নামায আদায় করেছেন, সেটির দরজায় লেখা–'হাসিমুখে আমরা শাহাদাত বরণ করে নিই।' সে দরজায়ও লেপটে আছে গোশতের টুকরা। ভেঙে খান খান হয়ে যায় ঘরের দরজা-জানালা। ফুটপাতে বইতে থাকে রক্তের বন্যা। সেই রক্তবানে ভাসতে থাকে শায়েখ ইয়াসীনের বাদামী জুতো। জুতো জোড়াও যেন আহত হয়েছে ক্ষেপনাস্ত্রের আঘাতে। পুড়ে ছাই হয়ে যায় তার হুইল চেয়ার। ইথারে-পাথারে ভাসতে থাকে লাশের পোড়া গন্ধ। শাহাদাত বরণ করেন হামাসের প্রাণপুরুষ শায়েখ আহমদ ইয়াসীন। অবসান ঘটে এগার সন্তানের জনক ৬৮ বছর বয়সী এক আধ্যাত্মিক বুর্যুগের জীবন। ফিলিস্তিনী আপামর জনগণ হারিয়ে ফেলে একজন হক্কানী আলেমে দীন। তার সাথী হন আরো আটজন দেহরক্ষী মুজাহিদ। মারাত্মকভাবে আহত হয় জানবাজ মুজাহিদ যুহাইর। শায়েখ ইয়াসীনের দুই পুত্রও আহত হলো এ হামলায়।

শায়েখ ইয়াসীনের শাহাদাতে শোকের সাগরে ভাসতে থাকে মুসলিম-বিশ্ব। কিছু কিছু অমুসলিমও হতবিহবল হয়ে পড়ে এ দুর্ঘটনায়। তারাও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন বিভিন্নভাবে। সাথে সাথে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বিক্ষুব্ধজনতা। যেন তাঁর শাহাদাতের শোক শক্তিতে পরিণত হয়েছে এখন। হামাসের শীর্ষনেতা ও দামেস্কভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান খালেদ মেশাল বিক্ষুব্ধ জনতার উদ্দেশ্যে বলেন–'দখলদারিত্বের অবসান না ঘটা পর্যন্ত আমরা আমাদের আত্মত্যাগ অব্যাহত রাখবো.....।' তার বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে জনতার মুখ থেকে শ্লোগান উঠে–'ফিলিস্তিনের জয় হবে–ইসরাইলের পড়ন হবে', 'ইয়াসীন মোদের চেতনা–ইয়াসীন মোদের অহংকার', 'আমরা সবাই ইয়াসীন-ফুরিয়ে যাবে ইসরাইলের দিন', 'শ্যারণ-বুশ ভাই ভাই–এক রশিতে ফাঁসি চাই'...।

বিশ্বজুড়ে শ্লোগানে শ্লোগানে প্রকম্পিত করে তোলে রাজপথ। ইয়াসীন হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে থাকে বিভিন্নভাবে। এ অবস্থায় নীরবে বসে থাকতে পারেনি বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় জনতা। রাজপথে নেমে আসে তারা। রাজধানী ঢাকার মতো কুমিল্লার জনগণও ফুসে উঠে এর প্রতিবাদে। সারা শহর মিছিলে মিছিলে প্রকম্পিত করে সমবেত হয় টাউন হল

ময়দানে। অগ্নিসংযোগ করে ইসরাইলী ও মার্কিনী পতাকায়। জুতা মারে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী জল্লাদ এরিয়েল শ্যারনের কুশপুত্তলিকার প্রতি। পরিশেষে রাজপথে পুড়ে ফেলে তা। এমনি করে সারাদেশের তাওহিদী জনতাই ফেটে পড়ে বিক্ষোভে।

নয়.

শায়েখ আহমদ ইয়াসীনের শাহাদাতের পরদিন হামাসের প্রধান মনোনীত করা হয় প্রখ্যাত নেতা আবদুল আজীজ রানতিসিকে। নেতৃত্বহীন দল চলতে পারে না। ইসরাইলকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। রানতিসি বলেন–'এ্যাপাচি হেলিকপ্টারের হামলায় প্রাণনাশ বা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করার মধ্যে এ্যাপাচি হেলিকপ্টারের হামলাকেই বেছে নেব আমি। কোনো আপোস নেই ইসরাইলী জানোয়ারগুলোর সাথে....।'

শায়েখ ইয়াসীনের শাহাদাতের জন্য ইসরাইল দায়ী হলেও প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রেরও হাত ছিল এখানে। ওয়াশিংটনের ইঙ্গিতেই এ দুঃসাহস দেখিয়েছে ইসরাইল। এ হত্যাকাণ্ডে ইসরাইল ব্যবহার করেছে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি ৪টি এ্যাপাচি হেলিকপ্টার। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে শায়েখ ইয়াসীন হত্যাকাণ্ডের নিন্দা প্রস্তাবে ভেটো দিয়ে প্রস্তাব নাকচ করে দেয় যুক্তরাষ্ট্র। আলজেরিয়া উত্থাপন করেছিল এ প্রস্তাব। ১১টি সদস্যরাষ্ট্র ভোট দেয় প্রস্তাবের পক্ষে। মাত্র ৩টি দেশ বিরত থাকে ভোট দানে। এ পর্যন্ত জাতিসংঘে ইসরাইলের পক্ষে ৩৮ বার ভেটোক্ষমতা ব্যবহার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এধরনের আর কোনো নজির নেই পৃথিবীতে। পরাশক্তির বলেই ইসরাইল পাখির মতো হত্যা করছে ফিলিস্তিনীদের। হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা শায়েখ আহমদ ইয়াসীনকে শহীদ করার সাহস পেয়েছে শেষ পর্যন্ত।

ঈমানের বলে বলীয়ান মর্দে মুজাহিদ শায়েখ আহমদ ইয়াসীন শাহাদাত বরণ করলেও তার আদর্শিক নেতৃত্ব ও চারিত্রিক প্রভাব বিশ্বমুসলিম জনপদে বিরাজমান। তাই এই মহান নেতার শাহাদাতের পর জন্ম গ্রহণকারী হাজার হাজার শিশুর নাম রাখা হয় 'শায়েখ আহমদ ইয়াসীন'।

গাজা সিটিতে অবস্থিত আল-শিফা হাসপাতাল। এর ধাত্রীবিদ্যা বিভাগের উপ-পরিচালক ডা. আকরাম আল হোসাইনী। তিনি জানান–হামাস নেতার শাহাদাতের পর বর্তমান গর্ভবতী ফিলিস্তিনী মায়েরা আল্লাহর কাছে মুনাজাত করছেন ছেলে সন্তানের জন্য। যেন তাদের নাম রাখতে পারেন শায়েখ আহমদ ইয়াসীন।

জাবির ও নোহা এক ফিলিস্তিনী দম্পতি। শায়েখ ইয়াসীনের শাহাদাতের ত্রিশ মিনিট পর এক ফুটফুটে ছেলে সন্তান প্রসব করেন মা নোহা। তারা এ নবজাতকের নাম রাখেন শায়েখ আহমদ ইয়াসীন। তার এ নাম রাখতে পেরে গর্ববোধ করছেন পিতা জাবির। জাবির বলেন–আমি চাই মহান নেতা শায়েখ ইয়াসীনের পদাংক অনুসরণ করে তার আদর্শিক ধারায় বেড়ে উঠুক আমার ছেলে। মা নোহাও একমত পোষণ করেন স্বামীর সাথে।

দশ.

খান ইউনিসে তোহফাদের বাড়ি গুড়িয়ে দেওয়ার সময় বিভিন্ন দেশে গিয়ে আশ্রয় নেয় অসহায় ফিলিস্তিনীরা। গাজা, আল-খলীল, হেবরন ছেড়েও চলে আসে অনেকে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতেও আসে কিছু ফিলিস্তিনী। তারাও শায়েখ আহমদ ইয়াসীনের শাহাদাতে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। এই প্রবাসী ফিলিস্তিনীরা যে মসজিদে নামায আদায় করেন, তারা তার নাম দিয়েছেন জেরুসালেম মসজিদ। তারা জুমা পড়ে এখানে। ফিলিস্তিনী খতীব জুমার খুতবায় বলেন–'৬৮ বছরের পঙ্গু বৃদ্ধ হামাসের প্রাণপুরুষকে হত্যা করেছে এতে কিছু যায় আসে না। বরং আমরণ জিহাদ চালিয়ে যাবে ফিলিস্তিনীরা। তাদের ব্যাপারে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–'ফিলিস্তিনীদের সবাই পরিত্যাগ করবে, তারপরও তাদের একটি জামাত জিহাদ চালিয়ে যাবে। একসময় ঈসা আলাইহিস সালাম আসবেন। তার নেতৃত্বে আবার ফিলিস্তিন মুক্ত হবে।'

বাংলাদেশী সাংবাদিক তাওফীক ফাহিম। আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে গেলেন তিনি। সেখানে কথা হলো ঢাকায় বসবাসরত ফিলিস্তিনী ডা. জামাল সাহেবের সাথে। কথা প্রসঙ্গে ডা. জামাল বলেন–'শায়েখ ইয়াসীন শাহাদাত বরণ করেছেন এতে অসুবিধা কি? হামাস কি খতম হয়ে গেছে? নতুন নেতৃত্ব চলে এসেছে আবার। শায়েখের আগেও ইসরাইলীরা অনেককে শহীদ করেছে। তবুও আমরা আমাদের মিশন চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য একটাই–আমরা ফিলিস্তিন ফিরে পেতে চাই।' সাংবাদিক তাওফীক ফাহিম বললেন–'ইসরাইলীরা যদি এরপর ফাতাহ নেতা ইয়াসির আরাফাতকে হত্যা করে?'

ডা. জামাল : ইসরাইলীদের অবৈধ সংসদে শ্যারণ বলেছে–ফোর্স ইজ দ্যা ওয়ে। সে হত্যা নীতিতে মেতেছে। আমরা একের পর এক শহীদ হবো। তবুও ইসরাইলীদের ক্ষমা করবো না। ডা. জামাল দুঃখ করে বলেন–আরাফাত বিশ্বের একমাত্র প্রেসিডেন্ট। প্রিজনার হিসেবে মাসের পর মাস তার কম্পাউন্ডে আটকে ছিলেন তিনি।

ফিলিস্তিনের চলমান পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাইলেন সাংবাদিক তাওফীক। ডা. জামাল বললেন–'ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিল মূলত ইউএস সিকিউরিটি কাউন্সিল। আমেরিকার হুকুম ছাড়া কিছুই করে না জাতিসংঘ।' সাংবাদিক তাওফীক বললেন–'এহেন পরিস্থিতিতে আরব রাষ্ট্রগুলো তো কিছু করলো না।' ডা. জামাল বলেন–'শুধু আরবরা কেন, গোটা মুসলিমবিশ্বের শাসকরাই তাদের গদি রক্ষায় ব্যস্ত। অথচ আমরা ফিলিস্তিনকে শুধু আমাদের নিজেদের মনে করি না। বাংলাদেশ যেমন বাংলাদেশীদের, পাকিস্তান যেমন পাকিস্তানীদের, বাইতুল মুকাদ্দাস তেমনি শুধু ফিলিস্তিনীদের নয়, বরং এটা বাইতুল্লাহ শরীফের মতো গোটা মুসলিম উম্মাহর। কারণ মুসলমানদের প্রথম কিবলা এটা।'

ফিলিস্তিনের চলমান প্রবাহ সম্পর্কে আরো অনেক কথাবার্তা চলতে থাকে তাদের মধ্যে। এমন সময় অপূর্ব একটি শিশু কিছু ফল-ফলাদির নাস্তা নিয়ে আসে ভেতর কামরা থেকে। তার পরপর আসে আরো দু'টি শিশু। খুবই চমৎকার, যেন বেহেশতী শিশু। তারা ডাক্তার জামালের

সন্তান। তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন সাংবাদিক তাওফীক। ডা. জামাল বললেন–'তাদের ভবিষ্যত আর কি হবে? হয়তো তারাও একদিন আত্মঘাতী হামলাকারী হবে। এভাবেই শাহাদাত বরণ করতে থাকবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম।'

ডা. জামালের বড় সন্তান আইআহ্। শিশুটিকে তার পিতা জিজ্ঞেস করলেন–'তুমি ইসরাইলীদের ভালবাসো?' সে বললো– না। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো–কেন? আইআহ্ বললো–'দে আর ব্যাড। তারা মানুষ হত্যা করে, খুব খারাপ লোক।' সে কথা বলার সময় বোঝা গেল, খান ইউনিসে ইসরাইলী বর্বরতার স্মৃতি এখনও দগদগে তার কচি মনে।

বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় সাংবাদিক তাওফীক ডা. জামালকে লক্ষ্য করে বললেন–'আপনাদের উপর ঈমানী পরীক্ষাটা কঠিন হচ্ছে।' ডা. জামাল তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন–'নো! নো! দুনিয়া হচ্ছে একটি ক্ষণিকের পান্থশালা। আমাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা তো জান্নাতে.....।'

এগার.

আজ নাবীলার শাদী। শাদী উপলক্ষে যেই আনন্দ উল্লাস হওয়ার কথা ছিল, তার কোনো কিছুই হচ্ছে না সেখানে। একটা চাপা নিরবতা বিরাজ করছে তাদের বাসায়। শায়েখ ইয়াসীনের শাহাদাত ও যুহাইরের আহত হওয়ায় ভেঙে পড়ে বাসার সবাই। মাঠে মারা যায় তাদের সব আনন্দ-উল্লাস। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তোহফা। নাওয়া-খাওয়া, ঘুম-বিশ্রাম কোনো কিছুর প্রতি খেয়াল নেই তার। আত্মভোলা অবস্থায় কাটতে থাকে তার দিনগুলো। এমতাবস্থায় হাসপাতালের বেড থেকে বার্তা পাঠায় যুহাইর। ডেইট না পিছিয়ে যেন সেরে ফেলা হয় নাবীলার শাদীর কাজ। উপরন্তু ডেইট বদলের কোনো সুযোগও ছিল না তখন। তাই বহাল রাখা হয় পূর্বের তারিখ।

ফিলিস্তিনী ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা সাতটা। যথাসময়ে এসে পৌঁছলো বরযাত্রী। একটা অনাড়ম্বর পরিবেশে সম্পন্ন হলো খাওয়া-দাওয়ার পর্ব। ছেলের পক্ষ থেকে ইজাবের কাজও সম্পন্ন হয়েছে ইতোমধ্যে। মেয়ের পক্ষের কবুলের কাজ চলছিল তখন। হঠাৎ মরুভূমির সাইমুম ঝড় বয়ে গেল বিয়ে বাড়িতে। হানা দিয়েছে পাষণ্ড ইয়াহুদীরা। বোমা মেরে গুড়িয়ে দিল

যুহাইরদের বাড়ি-ঘর। তোহফাদের বাড়ির দৃশ্যের অবতারণা ঘটলো সেখানে। শাহাদাত বরণ করলেন যুহাইরের বাবাসহ অনেকে। আহত হলো কতগুলো অসহায় প্রাণ। রক্তের নদী বয়ে গেল সেখানে। এই রক্তের নদীতে ভেসে বেঁচে রইলেন যুহাইরের বৃদ্ধা মা। নাবীলা ও তোহফাকে তাদের ক্যাম্পে তুলে নিয়ে গেল ইয়াহুদীরা।

বার.

একটি মজলুম জনপদে পরিণত হয়েছে ফিলিস্তিন। ইসরাইলী এ্যাপাচি হেলিকপ্টারের শব্দে ঘুম ভাঙে ফিলিস্তিনী অবুঝ শিশুদের। ইয়াহুদী ইসরাইলের দখলদারিত্বের জোয়াল কাঁধে নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে তারা। তাদের সব স্বপ্ন ধুলায় মিশিয়ে দিচ্ছে দানব ইসরাইলীরা। নির্বিচারে হত্যা করছে নিরীহ মুসলমানদের। এমন কোনো দিন নেই, যে দিন মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত হয় না ফিলিস্তিনের জমিন। ১৭ এপ্রিল ২০০৪ ইসরাইলীরা ক্ষেপনাস্ত্র হামলায় শহীদ করে ফেলে হামাসের নবনিযুক্ত নেতা আবদুল আজীজ রানতিসিকে। তার সাথে শাহাদাত বরণ করে তার পুত্র মুহাম্মদ এবং একজন দেহরক্ষী। তাদেরকেও শামিল করে দিল শায়েখ ইয়াসীনের কাতারে। শায়েখ ইয়াসীনের শাহাদাতের শোকসাগর সাতরে তীরে না পৌঁছতে বিশ্বমুসলিমকে আবার ভাসিয়ে দিল শোকের সাগরে।

ফিলিস্তিনের রক্তভেজা জমিনে পঙ্গুত্ব জীবন নিয়ে বেঁচে থাকে যুহাইর ও তার মা। যুহাইর হারিয়ে ফেলে তার দৃষ্টিশক্তি। আর ইসরাইলী ঘাতক বোমা কেড়ে নেয় যুহাইরের মায়ের একটি পা। তারা জানে না আর কতকাল সইতে হবে এই জুলুম-নির্যাতন। কবে অবসান হবে এই দুর্বিসহ জীবন। মুসলিমবিশ্ব কোনো প্রতিকার না করলে ঈসা ইবনে মারিয়াম পর্যন্ত বিলম্বিত হতে পারে তাদের এই দুর্বিসহ জীবন। তার আগমন ঘটলে এই জুলুম-নির্যাতন থেকে অবশ্যই মুক্তি পাবে তারা। কিন্তু ফিলিস্তিনীদের জন্য ভীষণ দেরি হয়ে যাচ্ছে এটা। তাদের প্রতিটা প্রহর কাটছে ঈসা ইবনে মারিয়ামের প্রতীক্ষায়। ❐

ক'ফোটা আনন্দাশ্রু

এক.

পহেলা বৈশাখ। পুবাকাশে উদয় হলো রক্তিম সূর্য। কিছুক্ষণ আগে ফজরের নামায পড়ে একপারা কুরআন তিলাওয়াত করলেন জুলায়খা বেগম। তারপর খোয়ারের দরজা খুলে দিতেই প্যাক প্যাক, কক্ কক্ শব্দে ছোটাছুটি করে বেরিয়ে পড়লো পালিত হাঁস-মুরগীগুলো। যেন সারারাতের বন্দিত্বের অবসান ঘটে মুক্তমনে বিচরণের সুযোগ পেল ওরা। মালসায় হাঁস-মুরগীর আধার দিয়ে সকালের নাস্তা তৈরি করতে রান্না ঘরে প্রবেশ করলেন জুলায়খা বেগম।

শহীদবাড়িয়া জেলার লেশিয়ারা গ্রামের বাসিন্দা বজলুর রহমান সাহেব। স্ত্রী জুলায়খা বেগম ও দুই ছেলে রুবেল ও রয়েলকে নিয়ে তাদের সংসার। রুবেল ৮ম শ্রেণীতে এবং রয়েল ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। রয়েল গত বছর ৫ম শ্রেণী থেকে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। বজলুর রহমান সাহেব দশ বছর বিদেশ করেছেন। মোটামুটি অবস্থাশালী। বর্তমানে ইরি স্কীম পরিচালনা করেন। অত্যন্ত অমায়িক মানুষ তিনি।

দুই.

সকাল সাড়ে সাতটায় বজলুর রহমান সাহেব এলেন স্কীম থেকে। বাদ ফজরই তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন ঘর থেকে। এসে খাটের উপর বিছানো

তোষকের সিথান কোণাটা আলগা করে দেখেন গত রাতে রাখা একশত টাকার নোটটা সেখানে নেই। টাকাটা না পেয়ে স্ত্রীকে ডেকে বললেন–'রাতে রাখা টাকাটা কোথায়?' জুলায়খা বেগম টাকার ব্যাপারে না জানার কথা জানিয়ে বড় ছেলে রুবেলকে কাছে পেয়ে বললেন–'রুবেল! তুই নিয়েছিস বাবা?'

রুবেল বললো–'আমি নেইনি, রয়েল নিয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করেন।'

তখন টাকার খোঁজে রয়েলকে খুঁজতে গিয়ে তাকে পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর 'আসলে জিজ্ঞেস করা যাবে' বলে সবাই ঘরে চলে এলেন। কিন্তু সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো, এখনও আসার কোনো নাম গন্ধ নেই। সকালের নাস্তাও সে করেনি। এমনটি কোনোদিন হয়নি তার। ভাবতে মোচড় দিয়ে উঠে বাবা-মায়ের ভেতরটা। রয়েলের কাকা খোরশেদ আলম সাহেব রীতিমতো পেরেশান হয়ে পড়েন। তিনি অত্যন্ত আদর-যত্ন করেন ভাইস্তাদের। পাড়া-পড়শীরা এসে তাদের সান্ত্বনা দিলেন বললেন–'আজতো বিভিন্ন স্থানে বৈশাখী মেলা হচ্ছে, হয়তো কারো সাথে মেলায় গেছে। একটু সবর করো চলে আসবে।'

কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ মানে না তাদের। খোঁজাখুঁজি চালিয়ে যাচ্ছে বিরামহীন ভাবে। এমনি করে দিন গড়িয়ে রাত এলো। পাড়ার ছেলেরা সবাই বাড়িতে ফিরেছে। কিন্তু এখনও ফিরেনি রয়েল। আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে মোবাইল করে খোঁজ নিল। আরো সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজ নেওয়া হলো। কোথাও নেই। হাউমাউ করে কান্নাকাটি শুরু করে দিল সবাই। সারারাত বিন্দুমাত্র ঘুম হলো না তাদের। সেই যে সকালে নাস্তা করেছে এরপর কারো মুখে কোনো দানাপানি যায়নি। আর মা জুলায়খা বেগম তো সকালের নাস্তাও করেননি। কারণ তিনি স্বামী-সন্তানদের আগে আহার মুখে তুলেন না। রয়েলকে না খাইয়ে কোনো দানাপানি মুখে তুলতে পারেননি।

তিন.

রয়েল হারিয়ে যাওয়ার পাঁচদিন পর কুমিল্লা রেল স্টেশনে আবিষ্কার করে নিজেকে। একটা যাত্রী ছাউনীর পাশে ঘুমিয়েছিল সে। সকালের সূর্যের

তীব্রতায় ঘুম ভাঙে তার। এখানে কীভাবে এসেছে তার কিছুই বলতে পারছে না সে। হারিয়ে যাওয়ার দিন রাতে আখাউড়া রেল স্টেশনের একটি হোটেলের চুলার পাশে শুয়েছিল। সেখান থেকে তার হারিয়ে যাওয়ার মাইকিং এর আওয়াজও শুনেছিল–'একটি হারানো বিজ্ঞপ্তি। আজ সকাল ৮টায় শহীদবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত কসবা থানার লেশিয়ারা গ্রাম থেকে মাকসুদুল আলম রয়েল নামের একটি ছেলে হারানো.....।' কিন্তু সে তার বাবার শাসনের ভয়ে মাইকের কাছে গিয়ে ধরা দেয়নি। সে কুমিল্লা স্টেশনে ঘুম থেকে উঠে দেখে তোষকের নিচ থেকে আনা একশত টাকার নোটটা তার পকেটে নেই। এমতাবস্থায় সে অসহায়ভাবে পিটপিট করে রেল স্টেশনে হাঁটছে। তাই দেখে রয়েলের চেয়ে কয়েক বছরের বড় একটি ছেলে এগিয়ে গেল। জেনে নিল তার বিস্তারিত হাল-হকিকত। বিস্তারিত জেনে রয়েলকে বললো–'আমার সাথে চল। আমি এক জায়গায় কাজ করি, তুই আমার সাথে থাকবি।'

উপায়ান্তর না দেখে রয়েল তার কথায় রাজি হয়ে গেল। শেষে দু'জনে একটি দূরপাল্লার লোকাল ট্রেনে চড়ে বসলো।

চার.

দু'সপ্তাহ হয়ে গেল এখনও কোনো খোঁজখবর পায়নি রয়েলের। গ্রামে-গঞ্জে মাইকিং করেছে, পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছে, বাংলাদেশ বেতারে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে অনেক। বিভিন্ন পীর-ফকিরের কাছে গিয়েছে। যে যেভাবে বলেছে হারানো মানিক পাওয়ার আশায় তার কথাই পালন করেছে। বিভিন্ন পীর-ফকির থেকে পানি পড়া, তাবিজ ইত্যাদি এনে হাজার হাজার টাকা খুইয়েছে। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি।

রয়েলের প্রাইভেট স্যার মুখলেসুর রহমান ভার্সিটিপড়ুয়া হলেও ধার্মিক এবং ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি সঠিক ধারণা রাখেন। গায়ে মাদানী পাঞ্জাবী ও টুপি। তিনি তাবলীগে সময় লাগিয়েছেন। এখনও সুযোগ পেলে কুমিল্লা জেলার মারকাজ নূর মসজিদে এসে সবগুজারী করেন। তিনি রয়েলের

ব্যাপারে তথাকথিত পীর-ফকিরদের কাছে এসে ধর্ণা দিতে নিষেধ করেছেন। রয়েলের বাবা-মাকে তাদের প্রতারণার কথা বুঝালেন। বর্তমান সমাজের অধিকাংশ পীর-ফকিরই ভণ্ড-প্রতারক। প্রতারণা করে তারা হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়। আর ফলের ফল কিছুই হয় না।

রয়েলের জন্য মীলাদ পড়াতে চাইলে এতেও তিনি বাধা দেন। তিনি বলেন–প্রচলিত মীলাদ কিয়াম শরীয়তসম্মত নয়। বর্তমানে মীলাদের নামে অল্পশিক্ষিত মৌলভীরা যা করে থাকে, তা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে, সাহাবায়ে কিরামের যুগে এবং তাবেয়ীনদের যুগে ছিল না। আর যা এই 'কুরুনে ছালাছা' তথা তিন সোনালী যুগে ছিল না তা শরীয়তের অংশ মনে করে পালন করা বিদআত। 'সকল বিদআত গোমরাহী-পথভ্রষ্ট। আর সকল পথভ্রষ্টতা জাহান্নামী।' এর চেয়ে ভাল আপনারা ধৈর্যধারণ করুন এবং রয়েলের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাকুন। দেখবেন রয়েল ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ। বন্দুকের বুলেটের টার্গেট মিস হতে পারে, কিন্তু সন্তানের জন্য কৃত মা-বাবার দোয়া কখনো মিস হয় না। তা অবশ্যই কবুল হয়।

মুখলেসুর রহমান একজন আদর্শ গৃহশিক্ষক। তিনি রুবেল ও রয়েলকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। খুব যত্ন সহকারে পাঠ দান করেন। বিশেষ করে রয়েল ভাল ছাত্র হওয়ায় তার প্রতি মুখলেসুর রহমানের আলাদা একটা আন্তরিক টান রয়েছে। আর এই আন্তরিকতার কারণে রয়েলের বৃত্তি পাওয়া অনেকটা সহজ হয়েছে। তার হারিয়ে যাওয়াটা তিনিও মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই তিনি নিজ উদ্যোগে রয়েলের ছবিসহ পোস্টার ছাপিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সেঁটে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। কিছু পোস্টার দূর-দূরান্তে পাঠিয়ে দিলেন।

পাঁচ.

অনেকদিন হয়ে গেল রয়েলের কোনো খোঁজখবর নেই। রয়েলবিহীন ঘরটা কেমন যেন শূন্য শূন্য লাগছে। রয়েলের পড়ার টেবিলে বইপত্র এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। বিছানার চাদর-বালিশ অযত্নে পড়ে আছে।

আলনার পার্শ্ব হ্যাংগারে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে তার জামা-কাপড়। আলনার নিচের তাকে অযত্নে পড়ে আছে অতিরিক্ত জুতো জোড়াগুলো। খাটের নিচে হাহাকার করছে রয়েলের ব্যাট-স্ট্যাম্প। যেন কতদিন ধরে রয়েলের হাতের ছোঁয়া পায় না....। এসব চেয়ে চেয়ে কেঁদে উঠেন মা জুলায়খা বেগম–'বাবা রয়েল! তুই কই? ফিরে আয় বাবা। আমার লাগি কি তোর মায়া লাগে না.....।' তা দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেন না বাবা বজলুর রহমানও।

ছয়.

শহীদবাড়িয়া জেলার বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া এক যুবক সিলেটে তার বড় বোনের বাড়িতে বেড়াতে গেল। বিকালে তালতো ভাইয়ের সাথে ঘুরতে এসে হালকা কিছু খেতে স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে ঢুকলো। গিয়ে বসতেই দু'গ্লাস ঠাণ্ডা পানি এনে টেবিলে রাখলো দশ-এগার বছরের একটি হোটেল বয়। তার চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। ছেলেটিকে কেমন যেন চেনাচেনা মনে হলো যুবকটির কাছে। তার নাম জিজ্ঞেস করলে সে অতি ছোট করে বললো–রয়েল।

অমনি যুবকের ভেতরটায় আশার সঞ্চার হলো। সে আবার জিজ্ঞেস করলো–তোমার আর কোনো নাম আছে? রয়েল বললো–আছে, মাকসুদুল আলম। নাম শুনে তার সন্দেহটা আরো ঘনীভূত হলো। সে নিখোঁজ সংবাদের কোনো পোস্টারে তার মতো ছেলের ছবি দেখেছে। কিন্তু নিজে থেকে কিছু বলতে পারছে না। কিছু বলতে গেলে বিষয়টা আবার কোন দিকে মোড় নেয়। হোটেল থেকে তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়লো দু'জন। পেছনে ফিরে একনজর দেখে নিল হোটেলের নাম। আল-ফাতেমা হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট। বাইরে এসে তালতো ভাইকে ঘটনার সামান্য ইঙ্গিত দিয়ে বললো–আমাকে আজই শহীদবাড়িয়ায় ফিরতে হবে। পরে বিস্তারিত কথা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল-ফাতেমা হোটেলে থেকে রয়েল কয়েকদিন তার নিখোঁজ সংবাদসম্বলিত ছবি পত্রিকাতে দেখেছে এবং এ সংবাদ রেডিওতে শুনেছে। যে ছেলেটা তাকে নিয়ে এসেছিল কেবল সেই তা জানে। সে এ বিষয়টা সবার কাছে গোপন রেখে শুধু হোটেল ম্যানেজারের কাছে সব বলে। ম্যানেজার সেই প্রথম থেকেই গোপনে তাকে পাচার করে দেওয়ার ফন্দি ফিকির করে আসছে।

বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ঐ যুবক অতিদ্রুত শহীদবাড়িয়া পৌঁছলো। দেয়ালে সাঁটানো একটি পোস্টার খুঁজে বের করে দ্বিতীয়বার মিলিয়ে নিল ভাল করে। নিমিষে তার যাবতীয় সন্দেহের অবসান ঘটলো। ঝটপট যোগাযোগ ঠিকানার সাথে দেওয়া তিনটি মোবাইল নাম্বার টুকে নিল। পরপর দু'টিতে চেষ্টা করে কোনো কাজ হলো না। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় নাম্বারটিতে ঢুকে গেল। দীর্ঘক্ষণ পর আশার সঞ্চার হলো তার বুকে। এ প্রান্ত থেকে স্পষ্ট রিং বাজার শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। অমনি অপর প্রান্ত থেকে কল রিসিভ করলেন রয়েলের বড় মামী। এতদিন এমন একটি কলের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিলেন তারা। সংবাদ শুনে অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন বড় মামী। মোবাইলে কোনো কথাই বলতে পারলেন না তিনি। জলদি সেট হাতে নিলেন বড় মামা আবদুল হান্নান সরকার। জেনে নিলেন অনেক তথ্য। রয়েল সিলেটের একটি রেস্টুরেন্টে আছে....। সাথে সাথে মোবাইল করে দিলেন রয়েলদের বাড়িতে। বিদ্যুৎবেগে সেখানে ছুটে গেলেন কয়েকজন অভিভাবক শ্রেণীর লোক। সংশ্লিষ্ট থানার ওসির সহায়তায় রয়েলকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন তারা। সুখের আবেশে ভরে উঠলো দরদী মায়ের শূন্য বুক। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো ক'ফোটা আনন্দাশ্রু। ❐

রক্তভেজা জায়নামায

এক.

কিছুক্ষণ পড়াশোনা করে কলেজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে সাঈদা। এমন সময় তার বান্ধবী লায়লা ও তামান্না এসে হাজির। সাঈদাকে বোরকা পরতে দেখে কটুক্তি করে বসলো লায়লা। তামান্নাও সুর মেলালো তার সাথে। বান্ধবীদের মন রক্ষার্থে বোরকা ছাড়াই রওনা দিল কলেজের উদ্দেশ্যে।

কথা বলতে বলতে কলেজ ক্যাম্পাসের কাছাকাছি পৌঁছে গেল তারা। এমন সময় সাঈদার চলার গতিরোধ করে বসলো কয়েকজন যুবক। মন্দ কিছু বলতে চাইলো ওরা। সাঈদা ওদের কথায় পাত্তা না দিয়ে পাশ কেটে চলে এলো ক্যাম্পাসের দিকে। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো ওরা। দাঁত কটমটিয়ে বললো–'দেখাবো মজা! মেয়ে মানুষ কাকে বলে।

সাঈদা তার বাবা-মাকে জানালো বিষয়টা। কিন্তু নিজে নিজে ক্ষোভ প্রকাশ করা ব্যতীত কিছুই করার ছিল না বাবা শামসুল হক সাহেবের। কারণ কাউকে পরোয়া করে চলে না এই বখাটেরা। এলাকার সবধরনের অপকর্ম সংঘটিত হয় ওদের মাধ্যমে। অনেক নিষ্কলংক মেয়েকে কলংকিত করেছে ওরা। খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, চুরি-ডাকাতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, জবরদখল এমন সব অপরাধমূলক কাজের নেতৃত্ব দেয় ওরা। এ ব্যাপারে ভূরি ভূরি মামলাও রয়েছে ওদের নামে। কিন্তু নিষ্পত্তি হতে দেরি হয় না ওদের মামলা–মুকাদ্দমা। শ্বশুর বাড়ির মতো জামাই আদরে বেড়িয়ে আসে কারাগারে। পুলিশী হেফাজতে থাকে ওরা। তাদের নাকের ডগায় করে যায় সব অপরাধমূলক কাজ।

দুই.

কয়েকদিন পরের কথা। জোহরের নামায আদায় করে মসজিদ থেকে বেরুচ্ছে ফারুক ও সোহেল। মসজিদের সামনে বিশাল মাঠ। মাঠ পেরিয়ে ফাঁকা রাস্তা। একটু দূরে কলেজ ক্যাম্পাস। এ সময় ঐ রাস্তায় মানুষের তেমন আনাগোনা থাকে না। সরল মনে হেঁটে যাচ্ছে একটি অবলা মেয়ে। অকস্মাৎ একটি ঘোলাটে গ্লাসের মাইক্রো এসে থামলো তার সামনে। মাইক্রোর দু'পাশের দরজা ধাক্কা মেরে বেরুলো দু'জন কালো সান পরা যুবক। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুখ চেপে ধরে মাইক্রোতে তুলে নিল মেয়েটাকে। চিৎকার করারও সুযোগ পেল না সে। মাইক্রো দ্রুতগতিতে চলে গেল পশ্চিম দিকে। সাঈদাকে কিডন্যাপ করেছে ঐ মাস্তানরা।

ফারুকের দৃষ্টি এড়ায়নি ব্যাপারটা। মটর সাইকেল ছিল তাদের সাথে। ফারুক মটর সাইকেল স্টার্ড দিয়ে জলদি উঠে বসতে বললো সোহেলকে। ফারুককে কিছুটা এবনরমাল মনে হলো সোহেলের কাছে। সোহেল পেছনে বসতে বসতে কী হয়েছে জানতে চাইল। ফারুক বললো–'যে বিষয়ে একটু পরেই জানা যাবে, সে বিষয়ে শায়েখ সাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাউকে জিজ্ঞেস করতেন না।' এরপর আর কোনো কথা বললো না সোহেল।

মাইক্রো অনুসরণ করে দ্রুত চলতে লাগলো মটর সাইকেল। এতক্ষণে রেল ক্রসিং পেরিয়ে চলে গেছে মাইক্রো। একটুর জন্য রেল সিগন্যালে পড়ে গেল ফারুক। একটা ঝাঁকুনি মেরে থামলো মটর সাইকেলটি। প্রতিটি মুহূর্ত ঘণ্টা হয়ে ধরা দিল তার কাছে। রেল যেন যেতেই চায় না। একটা জ্যাম্প দিয়ে চলে যেতে চায় ফারুক।

ট্রেন চলে যাওয়ার পর তুলে নেওয়া হল সিগন্যাল। এতক্ষণে আঁকাবাঁকা পথ ধরে তাদের চোখের আড়াল হয়ে গেছে মাইক্রোটি। ফারুক হাই গিয়ারে তুলে দিল মটর সাইকেলের গতি। আন্দাজ করে ছুটলো মাইক্রোর সন্ধানে।

একটা নির্জন সুপারি বাগানে ঢুকে পড়লো মাস্তানরা। এখনও কোনো ক্ষতি করতে পারেনি সাঈদার। অকস্মাৎ মটর সাইকেলের শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়ালো ওরা। একজন হাত ধরে রেখেছে সাঈদার। ওদের লক্ষ্য করে ফারুক বললো– 'ভালোয় ভালোয় তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে ...।' ফারুকের কথা শেষ করতে দেয়নি ওরা। তাদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হলো মাস্তানরা। তখন ফারুক ও সোহেল আত্মরক্ষার্থে কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে সাঈদাকে ছাড়িয়ে নিল ওদের হাত থেকে।

ফারুকের আত্মরক্ষার কৌশল দেখে সেদিনের মতো পালিয়ে বাঁচলো ওরা। কিন্তু কিছু করতে না পেরে শরীরের গোশত নিশপিশ করতে থাকে ওদের।

সাঈদাকে নিরাপদে বাসায় পৌঁছে দিতে পেরে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করলো ফারুক ও সোহেল। কিছু বলতে চাইলো সাঈদা। তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ফারুক বললো–'প্রয়োজনে রাস্তায় বেরুতে হলে পর্দা করে বেরুবেন। পর্দা নারীর ভূষণ, নারীর অলংকার। পর্দা নামায-রোযার মতোই ফরজ ইবাদত। পর্দা করে বেরুলে হয়তো আজকের এই অঘটন ঘটতো না।'

সাঈদা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলো ফারুকের কথাগুলো। তাদেরকে বাসায় ওঠার রিকোয়েস্ট করলো সাঈদা। 'সময় নেই' বলে চলে এলো তারা। পরিচয় হয়নি কারো সাথে কারো।

ঘটনার শুরু থেকে শেষ অবধি ফারুক ও সোহেল একবারও চোখ তুলে তাকায়নি সাঈদার প্রতি। বেগানা নারীর প্রতি তাকানো যে হারাম–এ মাসআলা ভাল করেই জানে ফারুক ও সোহেল। অনিচ্ছায় হয়তো আচমকা নজর পড়েছে দু'একবার।

তিন.

সাঈদা বাসায় না ফেরায় পেরেশান হয়ে পড়েছিল বাসার সবাই। পরে তাকে পেয়ে শান্ত হলো সবার অশান্ত মন। সাঈদার মুখে সব শুনলো ফ্যামিলির সবাই। সাহায্যকারীদের দেখা না পেয়ে খুবই আফসোস করলো তারা। অন্তর দিয়ে দোয়া করলো তাদের জন্য।

এ দুর্ঘটনার পর থেকে পর্দা করে বাইরে যায় সাঈদা। এখন আর কারো কটুক্তির তোয়াক্কা করে না সে। তার বান্ধবীদের অনেকেও বোরকা নিয়েছে তারা দেখাদেখি। বোরকা পরে সে নির্বিঘ্নে কলেজে আসা-যাওয়া করে। দেখা যায় না বলে চেনাও যায় না। তাই কেউ তাকে ডিস্টার্ব করে না।

সেদিন কলেজ বন্ধ। আধশোয়া অবস্থায় 'মাসিক আদর্শ নারী' ম্যাগাজিনটি পড়ছে সাঈদা। ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে একটি শিরোনামে এসে থেমে গেল তার দৃষ্টি–'পর্দা নারীর ভূষণ/ ফারুক হোসাইন।' শিরোনামটা দেখতেই তার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো সেদিনের কথাগুলো–'প্রয়োজনে রাস্তায় বেরুতে হলে পর্দা করে বেরুবেন, পর্দা নারীর ভূষণ, নারীর.....।'

লেখাটি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লো সে। জানতে পারলো কুরআন-হাদীসের অনেক কথা। পেল সঠিক পথের দিশা। বিমুগ্ধ হলো সাঈদা। লেখাটি পড়ে সে ভাবতে লাগলো–'লেখাটি কত মনমুগ্ধকর সুন্দর। ইসলামের বিধান কত নির্মল ও শান্তির.....।' সে কল্পনাও করতে পারেনি-এই লেখক তার সাহায্যকারীদের একজন। ভাবতে ভাবতে সাঈদা ম্যাগাজিনখানা বুকে জড়িয়ে ঘুমের কোলে ঢলে পড়লো।

চার.

সাঈদার মা যুবাইদা বেগম স্বামী শামসুল হক সাহেবকে বললেন–'মেয়েটা তো উপযুক্ত হয়েছে। তাকে আর ঘরে রাখা যায় না। বখাটেদের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে তার উপর। তাছাড়া হায়াত-মওতের কথা

তো বলা যায় না। তাকে একটা উপযুক্ত ছেলের হাতে তুলে দিতে পারলে শান্তি পেতাম.....।' স্ত্রীর কথার রেশ টেনে শামসুল হক সাহেব বললেন–'এব্যাপারে আমিও ভাবছি। ইনশাআল্লাহ কালই হাসনাত সাহেবের সাথে আলাপ করবো।'

হাসনাত সাহেব তাবলীগের সাথী। দু'জন একসাথে দীর্ঘদিন সময় লাগিয়েছেন আল্লাহর রাস্তায়। একারণে তাদের মধ্যে একটা ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

শামসুল হক সাহেবের বাসা থেকে হাসনাত সাহেবের বাসা প্রায় চার কিলোমিটার। বেলা এগারটায় তিনি হাজির হলেন বন্ধুবর হাসনাত সাহেবের বাসায়। দীর্ঘদিন পর শামসুল হক সাহেবকে পেয়ে যারপর নাই আনন্দিত হলেন তিনি। সালাম-মুসাফাহার পর আলাপচারিতায় মগ্ন হলেন দু'জন। শামসুল হক সাহেব মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কথা তুললেন। সন্ধান চাইলেন কোনো সৎ পাত্রের।

হাসনাত সাহেব আগে থেকেই শামসুল হক সাহেবের ফ্যামিলি সম্পর্কে অবগত। মেয়ের দীনদারীর কথা শুনে আরো আশ্বস্ত হলেন। তিনি বললেন–'আমিও একজন দীনদার ভাল মেয়ে খুঁজছি। মেঝ ছেলে ফারুক হোসাইন দাওরায়ে হাদীস শেষ করে টুকটাক ব্যবসা করছে। পাশাপাশি একটি ইসলামী ম্যাগাজিন সম্পাদনা করছে।'

'তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ খুব ভাল হয়'–বললেন শামসুল হক সাহেব।

হাসনাত সাহেব বললেন–'আশা করি সে আমার মতের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবে না। তারপরও ইসলামের বিধান অনুযায়ী ছেলে-মেয়ের পছন্দের একটা ব্যাপার-স্যাপার আছে। কারণ তারা সারাজীবন ঘর-সংসার করবে।'

পরে মেয়ে দেখার দিন-তারিখ নির্ধারণ করে চলে এলেন শামসুল হক সাহেব।

পাঁচ.

তারিখ অনুযায়ী মেয়ে দেখতে গেল হাসনাত সাহেবের ফ্যামিলি। বাসায় ওঠার পরই কেমন যেন একটা সন্দেহ কাজ করতে থাকে ফারুকের মনে। সে নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে। আদর-আপ্যায়ন শেষে মেয়ে দেখার অনুরোধ জানালো শামসুল হক সাহেব। ইসলামের রীতি অনুযায়ী একটি কামরায় গিয়ে বসলো ফারুক। কিছুক্ষণ পর সাঈদার দাদী সাঈদাকে নিয়ে হাজির হলো ফারুকের কামরায়। সন্দেহটা আরো গাঢ় হয়ে উঠে ফারুকের।

সাঈদার সুন্দর চেহারা এখনও ঘোমটার ভেতর লুকানো। ঘোমটা সরিয়ে সেখান থেকে দ্রুত কেটে পড়লেন সাঈদার দাদী। ফারুক লজ্জামাখা নয়নে তার দিকে তাকাতেই অস্ফুট বলে উঠলো–'আ-আপনি?' সাঈদাও অকস্মাৎ হতচকিত হয়ে উঠলো ফারুককে দেখে।

প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে কামরা থেকে বেরিয়ে পড়লো ফারুক। মেয়ে পছন্দ হয়েছে তার। বাবা-মাকে জানালো পছন্দের কথা। ওদিকে সব জানতে পেরে নিজের কামরায় এসে আনন্দাশ্রু ছাড়তে লাগলো সাঈদা। বিয়ের দিন-তারিখ ধার্য করে চলে এলো তারা।

ছয়.

বিয়ে বাড়ি। অনাড়ম্বর পরিবেশ। বর্তমান যুগের অন্যান্য বিয়ের মতো আতশবাজির কানফাটা শব্দ কিংবা আলোকসজ্জার জৌলুস নেই মোটেও। এসব অপসংস্কৃতি ও বিধর্মীদের রুসম।

তিনটি পাজেরো এসে থামলো বিয়ে বাড়িতে। মহরে ফাতেমীর মাধ্যমে যথাসময়ে সম্পন্ন হলো বিয়ের কাজ। যৌতুক আদান-প্রদান দূরে থাক, যৌতুক-টৌতুকের প্রসঙ্গই উঠেনি বিয়েতে। খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ করে কনে উঠিয়ে নিয়ে আসা হলো হাসনাত সাহেবের বাসায়। ইসলামের রীতি অনুসারে বধূবরণ করে নিল সবাই।

সাত.

বাসর রাত। ফুলশয্যায় বেনারসীর ঘোমটা জড়িয়ে বসে আছ সাঈদা। অপেক্ষা করছে কাঙ্ক্ষিত পুরুষের আগমনের। এরই মধ্যে দরজা খটমট করে প্রবেশ করলো ফারুক। লজ্জাজড়িত কণ্ঠে সালাম দিল সাঈদা। সালামের জবাব দিয়ে তার পাশে গিয়ে বসলো ফারুক। ধীরে ধীরে লজ্জা কাটিয়ে আবেগ-অনুভূতির কথা বলতে লাগলো দু'জনে। পুনরাবৃত্তি করলো অতীতের সব ঘটে যাওয়া ঘটনার। পাশাপাশি শুয়ে বলতে লাগলো অনেক দিনের জমানো হৃদয়ের কথামালা। একসময় সাঈদা বললো–'চলুন আগে কয়েক রাকাত নামায পড়ে নিই।' এরপর তারা অজু করে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে গেল।

এমনি অবস্থায় হঠাৎ কালো মেঘে ছেয়ে গেল তাদের ভাগ্যাকাশ। আকস্মাৎ উত্তর দিকের জানালা দিয়ে একটি বুলেট এসে বিঁধলো ফারুকের গায়ে। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলোপাতাড়ি আরো কয়েকটি বুলেট এসে বিঁধলো ফারুক ও সাঈদার নরম বদনে। বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল তাদের শরীর। লালে লাল হয়ে উঠে ফারুকের সাদা শেরওয়ানী। রক্তরাঙা হয়ে উঠে সাঈদার মেহেদীমাখা হাত। ভিজে জ্যাবজ্যাবা হয়ে উঠে লাল বেনারসী। রক্তস্নাত হয়ে উঠে জায়নামায। রক্তবাসরে পরিণত হয় তাদের মধুবাসর। ততক্ষণে একটি এ্যাম্বুলেন্স তাদেরকে বহন করে নিয়ে চললো হাসপাতালের দিকে। ❐

সমাপ্ত

najmul halder-01911031184 ■ THE LIGHT

ইসলাম
ও
সমাজের
অসঙ্গতিমূলক গল্পগুচ্ছ

রক্তভেজা জায়নামায

মাওলানা মুনীরুল ইসলাম

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী